ফুলের তোড়া।

উপন্যাস।

"মাতাজী আশ্রম" ও "আজব ফকির" প্রণেতা

শ্রীচুনিলাল মিত্র দ্বারা

সম্পাদিত।

১২৭নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, দরজিপাড়া হইতে

সি, সি, বসাক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

নূতন সংস্করণ।

কলিকাতা;

১২৭ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "বসাক-প্রেসে"

শ্রীদীননাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪।

ফুলের তোড়া।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

শ্রাবণের ধারা বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে, পথ ঘাট মাঠ সকলই কর্দ্দমময়, বৃক্ষলতাদির উপর বারিবিন্দু পতিত হইয়া মুক্তাফল সদৃশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বর্ষা প্রপীড়িত বিহঙ্গকুল নিরাশ্রয় হওত পক্ষ বিস্তার-পূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় বসিয়া মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিয়া যেন অস্ফুট ভাষায় বলিতেছে, "রঘুপতি গিরিবর গিরিধারী।" এমন সময়, মেদিনীপুর হইতে তমলুক পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথ, সেই রাজপথ দিয়া এক ব্যক্তি তমলুক অভিমুখে চলিয়াছে। ইহার নাম ভজহরি, দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, অবয়ব বলিষ্ঠের ন্যায়, মুখশ্রী ভাল নয়; কিন্তু তন্মধ্য হইতে সততার জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া তাহার স্বভাবকে উজ্জ্বল করি-

রাছে। তাহার পরিধের বস্ত্রখানি ক্ষুদ্র, জানুর উপরি পর্য্যন্ত লম্বিত, তদ্ব্যতীত তাহার কটীদেশে স্বতন্ত্র বস্ত্রের খুঁচকি পরিশোভিত হইতেছে। ভজহরি গোল-পত্রের ছত্র মস্তকে ধারণ করিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে গমন করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে সেই কালিন্দী-সম কৃষ্ণ ঘনরাশির দিকে চাহিতেছে, এবং এক এক বার বলিতেছে, "পথ যে আর ফুরায় না।" ভজহরি জাতিতে কটকি কায়স্থ, বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার অভাবে এবং দরিদ্রতা প্রযুক্ত তাহাকে মাল্যকারের কার্য্য শিখিতে হইয়াছিল; কয়েক বৎসর হইতে সে কলিকাতার নিকটস্থ খুঁড়ার গজেন্দ্র বসু নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির উদ্যানে উদ্যান-পালকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ভজহরির জন্মস্থান মেদিনীপুর গ্রাম; কিন্তু তথায় তাহার দূরসম্বন্ধীয় আত্মীয় ব্যতীত অন্য কেহ পরিজন ছিল না। বহু দিবস অবধি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া ভজহরি একমাস হইল বাটী আসিয়াছিল। এক্ষণে পাছে মনিবের সহিত কথার খেলাপি হয়, এই ভাবিয়া অদ্য সে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিতেছে।

ভজহরি ঘন পদবিক্ষেপে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ষ্টিমারের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখনও ষ্টিমার আসিতে বিলম্ব আছে দেখিয়া, সে রূপনারায়ণের উপকূলস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল। কিছুক্ষণ বসিবার পর সে দেখিতে পাইল, অদূরে অনুমান চারি বৎসর বয়স্কা এক বালিকা, সেই বরষায় ভিজিয়া ভিজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, আর এক এক বার সম্মুখস্থ একটী মৃতদেহের মুখের নিকট মুখ লইয়া বলিতেছে, "মা তুই ওঠনা, আর এ

ভিজে মাটীতে কতক্ষণ পড়ে থাক্‌ব, আমার যে শীত কচ্চে।" বালিকার এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভজহরি আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ব্যস্ততা সহকারে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই কণ্টকাকীর্ণ রূপনারায়ণের উপকূল দিয়া অতি কষ্টে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। বালিকা তাহার মাতাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া এত কাতর হইয়াছিল যে, সে সময় তাহার দৃষ্টি তাহার মাতার মুখমণ্ডল ব্যতীত আর কোথাও ছিল না। ভজহরি যে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সে একবার তাহার ক্ষুদ্র করদ্বয় দ্বারা সেই মৃতা রমণীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যখন তুলিতে পারিল না, তখন সে বলিল, "ওঠ না মা, আমি যে ছেলেমানুষ, কেমন ক'রে তোকে তুল্‌ব।" হায়! বালিকার কথা কে শুনিবে? তাহার আধ আধ মা মা-বুলি শূন্যে মিশিয়া গেল। রমণী যদি জীবিতা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত এতক্ষণ তাহাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শতবার তাহার মুখচুম্বন করিত; কিন্তু এখন সে কি করিবে, কালচক্রে পড়িয়া তাহাকে মায়া মমতা-শূন্য হইতে হইয়াছে। এইরূপে বালিকা কখন তাহার মাতার মুখচুম্বন করিতে লাগিল, কখন বা বাল্যচপলতা বশতঃ সেই মৃতদেহের উপরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, "কেমন উঠ্‌বিনি, তুই যতক্ষণ না উঠ্‌বি, ততক্ষণ মার্‌ব"। ইহা ব্যতীত কখন বা সে চিবুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি আঘাত করিয়া বার বার বলিতে লাগিল, "তুই কথা কইবিনি, তোর সঙ্গে আড়ি, আড়ি, আড়ি।" এই কথা বলিয়া বালিকা মানভরে মাতার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিল,

এবং সেই ক্ষুদ্র হস্তে রূপনারায়ণের জল নাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, তাহার মাতা তাহাতেও তাহাকে ক্রোড়ে লইতেছে না, তখন তাহার আর মান রহিল না। এবার সে সেই মৃতা রমণীর বক্ষে পড়িয়া; "আমার খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দেম" ইত্যাদি কথায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ভজহরি এতক্ষণ মৃণ্ময়-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া এই সকল ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে বালিকার ভাব দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার চক্ষে জল আসিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "নারায়ণ! এ সকল তোমারই মর্জি।" ভজহরি তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সেই মৃতারমণীর নিকটে যাইয়া দেখিল, রমণীটীর বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর, তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিলে তাহাকে ভদ্রমহিলা বলিয়াই মনে হয়। এতদ্ব্যতীত আরও দেখিল, তাহার পরিচ্ছদ বিধবার ন্যায়। রমণী যেরূপ ভাবে পড়িয়া আছে, তাহাতে বোধ হয় যেন সে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। বালিকা এতক্ষণ পরে ভজহরিকে দেখিয়া মাতার বক্ষ হইতে উঠিয়া আধ আধ বুলিতে তাহাকে কহিল, "হেঁগা মাকে উঠিয়ে দাওনা গা, মা যে অনেকক্ষণ ঘুমুচ্চে। আমার ক্ষিদে পেয়েছে, বল্‌চি মা তবু উঠ্‌ছে না, তুমি মাকে তুলে দাওনা গা।" মাতৃহীনা বালিকার সকরুণ বাক্য শুনিয়া ভজহরির হৃদয় আর্দ্র হইল, সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার মা এখনই উঠ্‌বে, তুমি আর কেঁদনা।" এই বলিয়া ভজহরি তাহার মুখ-

মস্তক ও গাত্রের জল উত্তরীয় দ্বারা মুছাইয়া দিল এবং নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে যাইয়া বালিকার সেই মলিন আর্দ্র বস্ত্র খানি অঙ্গ হইতে খুলিয়া, বুঁচকি হইতে অপর একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। তৎপরে বস্ত্রখানি ফেলিয়া দিতে গিয়া দেখিল যে তাহাতে কি বাঁধা রহিয়াছে, তখন সে সেই বন্ধনটী খুলিয়া দেখিল, যে একখানি কাগজ ও একটী অঙ্গুরীয়। কাগজ খানিতে কি লেখা আছে এবং অঙ্গুরীয়-টীতেও কাহার নামাঙ্কিত রহিয়াছে। তখন সে তাহা আবশ্যক বিবেচনাপূর্ব্বক নিকটে রাখিল, তৎপরে বুঁচকির ভিতর হইতে যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন বাহির করিয়া তাহাকে খাইতে দিল। বালিকা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। সুতরাং সে খাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি তাহার মাতার প্রতি রহিল। সে খাইতে খাইতে এক একবার বলিতে লাগিল "ওগো তুমি মাকে তুলে আন না, মা যে অনেকক্ষণ ঘুমুচ্চে।" ভজহরি তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিল, "তোমার মার অসুখ করেছে, তাই শুয়ে আছে, এখনি উঠ্‌বে।" এবার ভজহরির স্তোকবাক্যে বালিকার মন বুঝিল না, সে সেই স্থান হইতে "মা ওঠনা মা" ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে ডাকিতে লাগিল।

প্রকৃতির বিচিত্র গতি! ইতিপূর্ব্বেই বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিধারা পড়িতেছিল, এক্ষণে তাহা ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জোয়ার আসায় রূপনারায়ণের জল ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই জল অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইয়া, যেখানে বালিকার মাতা এই দৃশ্য জগৎকে অসার জ্ঞানে ধিক্কার দিয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া পড়িয়া

আছে, সেই স্থানে আসিয়া তাহার চরণ স্পর্শ করিতে লাগিল। মাতাকে তুলিবার নিমিত্ত বালিকা ভজহরিকে পুনরায় অনুরোধ করিল। ভজহরি, যাই, আসিতেছি ইত্যাদি স্তোকবাক্যে তাহাকে ভুলাইতে লাগিল; কিন্তু সে ভুলিল না, তাহার প্রাণ তাহার মাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, "আয় না মা" ইত্যাদি কথায় কাঁদিয়া উঠিল। রূপনারায়ণের জল রমণীর চরণ ছাড়িয়া কটিদেশ স্পর্শ করিল দেখিয়া, "আমি মার কাছে যাব," ইত্যাদি কথা বলিয়া বালিকা তাঁহার নিকট যাইবার উপক্রম করিল; কিন্তু ভজহরি যাইতে দিল না, অগত্যা বালিকা সেই স্থান হইতেই, "মা মা" শব্দে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই রমণীর পরিত্যক্ত দেহ রূপনারায়ণেরবক্ষে ভাসিয়া স্রোতের অভিমুখে যাইতে লাগিল, বালিকা তাহার মাতাকে জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূতলে পড়িয়া মা! মা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত হইল, তাহার রমণীয় কলেবর ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল। ভজহরি যতই তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই সে ভূতলে পড়িয়া বলিতে লাগিল "আমার মা কোথায় গেল, মাকে ডাক না।" এইরূপে বালিকা যে কতই কাঁদিতে লাগিল, লেখনী তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। বালিকার আধ আধ বুলি, সকরুণ মাতৃহারা আর্ত্তনাদ, অশ্রুপূর্ণ মলিন মুখখানি এবং ধূলায় ধূসরিত কমনীয় কলেবরের বিষয় কি বর্ণনা করিব, লেখনি যে আর চলে না। ইহার সহিত আবার ভজহরি রোদনে যোগ দিয়াছে। উভয়ের রোদন-ধ্বনির সহিত

সেই জন-শূন্য রূপনারায়ণের উপকূলও নীরবে কাঁদিয়া উঠিল।

ভজহরি তখন অশ্রুজল মুছিয়া বালিকাকে ধীরে ধীরে ক্রোড়ে তুলিল এবং উত্তরীয় দ্বারা তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল, "তোমার মা বাড়ী গিয়াছে, আমাকে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছে, তোমাদের বাড়ী কোন্ দিকে, চল তোমাদের বাড়ি তোমার মার কাছে নিয়ে যাই।" মাতা বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে শুনিয়া বালিকার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সে তখন বলিল, "কখন গেল।"

ভজহরি। এই মাত্র গেল।

বালিকা। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ঐ আমাদের ঘর, তুমি আমাকে নিয়ে চল।

ভজহরি তখন বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিল। গৃহটী রূপনারায়ণের উপকূলেই ছিল; সুতরাং যাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। ভজহরি চাহিয়া দেখিল, যে গৃহদ্বার মুক্ত, গৃহমধ্যে একখানি জীর্ণ কাঁথা ও গুটীকয়েক হাঁড়ি এবং একটী ভগ্ন জলপাত্র আর একটী ভোজনপাত্র ব্যতীত আর কিছুই নাই।

বালিকা তখন গৃহমধ্যে তাহার মাতাকে দেখিতে না পাইয়া বলিল, "কৈ, মা ত ঘরে নাই।"

তোমার মা হয়ত পাড়ায় কাহারও বাড়ী গিয়াছে; এখনি আস্‌বে। এই কথা বলিয়া ভজহরি বালিকাকে প্রবোধ দিয়া নিকটস্থ জন কয়েক ভদ্রলোক ডাকিয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বলিল। ভদ্রলোকগণ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "বামুন-ঠাকুরুণের আজ সকালে অসুখ হয়েছিল বটে; কিন্তু কখন যে

রূপনারায়ণের তীরে গিয়া শুয়েছেন, তা ত কিছুই বল্‌তে পারি না। আহা. বামুনঠাকরুণ বড়ই গরিব ছিলেন, ভিক্ষা করিয়া কোনরূপে কন্যাটীকে প্রতিপালন করিতেন। এখন কন্যাটীরই বা কি হবে?" ভজহরি তাঁহাদের কথা শুনিয়া কহিল, কন্যাটী আপনারা রাখুন, নতুবা কন্যাটীর আর কিছুই গতি নাই।

ভদ্রলোকগণ তখন ভজহরি কথায় উত্তর করিল, "আমরা নিয়ে কি কর্‌ব, কে উহার তত্বাবধারণ কর্‌বে। তবে ঐ বাড়ীতে নিয়ে যাও, উহাঁরা রাখলেও রাখতে পারেন।" ভজহরি তাহাদের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হতাশ্বাস না হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিল।

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা যে বাড়ী দেখাইয়া দিল, সে বাটীর গৃহস্বামী দ্বারেই দণ্ডায়মান্ ছিলেন। ভজহরি তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক উত্তরীয় হইতে কাগজ খানি ও অঙ্গুরীয়টী বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিল। গৃহস্বামী তখন সেই পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল।

সুসঙ্গিনীর জীবনবৃত্তান্ত।

মহাশয়! আমার নাম সুন্দরী বামনি। আমি নিবোধ দত্তপুকুরের রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যা। অল্পবয়সে স্বামী-পুত্র-পরিজন হারাইয়া উদরের দায়ে কলিকাতা সিমলার বাজারের সন্নিকট কৈলাস সিংহ নামক জনৈক ভদ্রলোকের বাটীতে রন্ধনকার্য্যে নিযুক্তা হইয়াছিলাম। তিনিও আমাকে মেয়ের মত যত্ন করিতেন; কিন্তু এই রাক্ষসী পাপপ্রলোভনে পড়িয়া, তাঁহার একমাত্র কন্যা সুসঙ্গিনীকে চুরি করিয়া আনিয়া-

ছিল। তখন এই সুসঙ্গিনীর বয়স দুই বৎসর মাত্র। এক্ষণে বোধ হয়, ইহার বয়স চারি বৎসর হইবে। ইহাকে যখন চুরি করিয়া আনি, তখন মনে করিয়াছিলাম, ইহাকে মারিয়া ফেলিয়া ইহার অলঙ্কারগুলি লইয়া কাশী অভিমুখে পলাইয়া যাইব। কিন্তু সে সময়ে এই রাক্ষসীর প্রাণে মায়ার সঞ্চার হওয়াতে, আর মারিতে না পারিয়া তাহাকে লইয়া তমলুকে পলাইয়া আসিয়াছিলাম। তাহার যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া অনেক দিন স্বচ্ছন্দে খাইয়াছিলাম। কেবল এই অঙ্গুরীয়টী নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়াছিলাম। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে যখন আমার ভেদ বমী আরম্ভ হইয়াছিল, এবার মৃত্যু স্থির জানিয়া এই পত্রখানি লিখিয়া অঙ্গুরীয়টীর সহিত সুসঙ্গিনীর অঞ্চলে এই আশায় বাঁধিয়া দিলাম যে, আমার অবর্ত্তমানে যে কেহ সুসঙ্গিনীকে প্রাপ্ত হইবে, সে এই পত্র পাঠ করিলেই তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে। এক্ষণে রাক্ষসীর এই মাত্র অনুরোধ যে, সুসঙ্গিনীকে যিনি প্রাপ্ত হইবেন, তিনি যেন ইহাকে ইহার পিতার নিকট লইয়া যান। আর কৈলাস বাবুকে যেন বলেন, রাক্ষসী সুন্দরীবামনী মরিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার পাপের এখনও শাস্তি হয় নাই।

গৃহস্বামী পত্রখানি পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং তৎপরে অঙ্গুরীয়টী দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে; কৈলাসচন্দ্র সিংহের কন্যা শ্রীমতী সুসঙ্গিনী দাসী। সাং কলিকাতা, সিমুলিয়া বাজার।

গৃহস্বামী পত্র ও অঙ্গুরীয়টী লইয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি চিন্তা করিলেন, পরে ভজহরিকে বলিলেন, "বাপু তোমার বাড়ী কোথায়?"

ভজহরি। আমার বাড়ী মেদিনীপুর।

গৃহস্বামী। এখন কোথায় যাবে?

ভজহরি। আমি কলিকাতার নিকটস্থ খুঁড়ার গজেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে কর্ম্ম করি। এখন আমি সেইখানেই যাব।

গৃহস্বামী। আচ্ছা বেশ উপায় হয়েছে, এখন সৎযুক্তি এই যে, তুমি যখন কলিকাতায় যাচ্ছ, তখন ইহাকে সঙ্গে ক'রে তুমি কলিকাতায় লয়ে যাও। আর শিমুলিয়ায় গিয়া যাঁর কন্যা তাঁহাকে দেবে, নতুবা আর কোন উপায় নাই।

ভজহরি যখন দেখিল যে, কেহই বালিকাটিকে রাখিতে চাহে না, তখন সে অগত্যা তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী হইল এবং সেই অভিপ্রায়ে ষ্টীমার ঘাটাভিমুখে যাত্রা করিল।

বালকবালিকাগণ স্বভাবতঃ যেমন অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিলে, কি কোনরূপ পরিশ্রম করিলে ক্লান্ত হইয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়ে, সুসঙ্গিনীও তদ্রূপ মাতৃশোকে অধীর হইয়া অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর এক্ষণে ভজহরির বক্ষের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সে এ সব বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না। ভজহরি ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া দেখিল যে, ষ্টীমার প্রস্তুত রহিয়াছে, আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই। তখন সে সুসঙ্গিনীর নিমিত্ত বাজার হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও কিছু আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইল এবং অবশেষে টিকিট লইয়া ষ্টীমারে আরোহণ করিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় ষ্টীমার আসিয়া কলিকাতা কয়লাঘাটে উপস্থিত হইল। ভজহরি তখন ষ্টীমার হইতে নামিয়া শিমুলিয়া যাইবার জন্য

একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া সিমুলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল, এবং কিছুক্ষণ পরেই সিমুলিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎ-পরে কৈলাসচন্দ্র সিংহের অনেক অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না। অবশেষে সে সিমুলিয়া বাজা-রের নিকট একটী ভদ্রলোকের বাটী গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় এখানে কৈলাসচন্দ্র সিংহের বাড়ী কোথায়?

ভদ্রলোক। কৈ এখানে ত বাপু কৈলাস সিংহ কেউ নাই, তাঁ'র কোন ঠিকানা জান?

ভজহরি। আজ্ঞে না, তবে এইমাত্র জানি, তাঁর বাড়ী সিমলার বাজারের কাছে।

ভদ্রলোকটী অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ওঃ কৈলাস বাবু নামে এক ব্যক্তি ছিলেন বটে, তিনি কমিসরিয়েটেতে কাজ করিতেন, প্রায় দেড় বৎসর হ'ল, কাবুলের দিকে বদ্‌লি হয়েছেন।"

ভজহরি। বদ্‌লি হ'বার কারণ কি, তা কিছু জানেন।

ভদ্রলোক। না, তা কিছুই জানি না।

ভজহরি। আচ্ছা মহাশয়! তাঁর বাড়ী কোথায় জানেন?

ভদ্র। বিশেষ বল্‌তে পারি না, তবে বোধ হচ্চে বর্দ্ধমান।

হায়! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? বৃদ্ধবয়সে এই কৈলাস বাবুর সুসঙ্গিনী নাম্নী এক কন্যা হয়। সুসঙ্গিনী ব্যতীত কৈলাস বাবুর আর দ্বিতীয় সন্তানাদি ছিল না; সুতরাং সুসঙ্গিনী কৈলাস বাবুর অতিশয় আদরের কন্যা ছিল। সুসঙ্গিনী হারাইয়া যাইবার পর তিনি শোকে এতদূর অভিভূত হইয়া-ছিলেন যে, তাঁহার কলিকাতায় বাস করা একেবারে অসহ্য

হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ সুসঙ্গিনীর মাতা বিধুমুখী সুসঙ্গিনী-হারা হইয়া দিবারাত্র রোদন করিত, সেই কারণে তিনি তাঁহাকে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দিয়া স্বইচ্ছায় কাবুলে বদলি হইয়াছেন। বিধাতা সুসঙ্গিনীর অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ লিখিয়াছেন।

ভজহরি নিরুপায় হইয়া সুঁড়া অভিমুখে যাত্রা করিয়া রাত্রি প্রায় একটার সময় গজেন্দ্র বাবুর বাগানে পঁহুছিল। গজেন্দ্রবাবু সুঁড়ার মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। সে সময় সুঁড়াতে তাঁহার ন্যায় গণ্যমান্য লোক একজনও ছিল না। চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক, তেমনি গজেন্দ্র বাবু শতগুণে গুণান্বিত হইলেও তাঁহার একটী দোষ ছিল, সেটী তাঁহার কড়া মেজাজ। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যায়, সেটী তাঁহার প্রকৃতিগত দোষ নহে, সেটী কেবল গঞ্জিকার মাহাত্ম্য; এই কারণেই যে তিনি সকলের নিকট অপ্রিয় হইতেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষতঃ যখন তিনি গঞ্জিকায় মত্ত হইতেন, তখন তাঁহার নিকট সামান্য দোষ করিলে অমনি তিনি সপ্তমে চড়িয়া ব্যঞ্জন-বর্ণের মধ্যে যে কোন বর্ণে যে কয়েক প্রকার গালাগালি হইতে পারে, সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইলেও গজেন্দ্র বাবু তাহাকে সে গালি দিতে ক্ষান্ত হইতেন না। ভজহরি সুসঙ্গিনীকে উদ্যান বাটীর মধ্যস্থ গৃহে শয়ন করাইয়া, গজেন্দ্র বাবুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। গজেন্দ্র সবে মাত্র গঞ্জিকা সেবন করিয়া ছেন, ভজহরিকে প্রণাম করিতে দেখিয়া, পঞ্চম হইতে সপ্তমে চড়িয়া সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ দুই একটী গালি দিয়া তাহাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "তোর মত লোক আমি চাই না, তুই দশদিনের ছুটি নিয়ে একমাস কর্‌লি।"

ভজহরি বাবুর মেজাজ জানিত, সুতরাং সে কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তৎপরে ধীরে ধীরে এক এক পদ করিয়া গৃহ অভিমুখে অগ্রসর হইল। সে রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর দিবস প্রত্যুষ হইতে যে কেহ সুসঙ্গিনীর বিষয় ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করিত, সে তাহাকেই বলিত, এটি আমার মেয়ে, সেই অবধি সকলে সুসঙ্গিনীকে ভজহরির কন্যা বলিয়াই জানিত। এইরূপে দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, সুসঙ্গিনীও ভজহরিকে একমাত্র আত্মীয় বলিয়া জানিতে আরম্ভ করিল। আর ভজহরিও অপত্যস্নেহে এতদূর বশীভূত হইয়াছিল যে, যদি কেহ তাহাকে লইয়া যায়, এই ভয়ে, সে আর ভ্রমেও কাহার নিকট তাহার পরিচয় প্রকাশ করিত না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বরাগ।

এই আখ্যায়িকার পর একে একে ক্রমান্বয়ে নয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া সুসঙ্গিনী এক্ষণে ত্রয়োদশে পদবিক্ষেপ করিয়াছে, দিবসের পর দিবস মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিক্রম করিয়া শশিকলার ন্যায় সুসঙ্গিনী যতই যৌবনের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভজহরির চিন্তা-স্রোত ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অপত্যস্নেহে ভজ-

হরি এমনি মুগ্ধ হইয়াছিল যে, সে সুসঙ্গিনীকে নিজ ঔরসজাত কন্যার ন্যায় ভালবাসিত। সে নিজে না খাইয়া তাহাকে উত্তম সামগ্রী খাওয়াইত এবং যাহা কিছু বেতন পাইত, তদ্দারা সুসঙ্গিনীকে দুই একখানি উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কার ক্রয় করিয়া দিত। সুসঙ্গিনীও তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিত এবং সময়ে আব্দার করিয়া, যাহা কিছু চাহিত, ভজহরি সাধ্যমত তাহা আনিয়া দিত। ৮।৯ বৎসর হইতেই সুসঙ্গিনী ভজহরির পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইয়াছিল, সে স্বয়ং রন্ধন করিত এবং অন্যান্য গৃহ কার্য্য যাহা কিছু থাকিত, তাহাও স্বহস্তে সমাধা করিত। এতদ্ব্যতীত ভজহরির অবসর না থাকিলে, ফুলের ডালি লইয়া গজেন্দ্র বাবুর বাটীতে দিয়া আসিত; কিন্তু যখন হইতে ভজহরি তাহাতে যৌবনের লক্ষণ সকল দেখিতে পাইল, তখন হইতে সে তাহাকে উদ্যানের বাহির হইতে দিত না। সেই অবধি সুসঙ্গিনী অনেক সময় পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় ভজহরির পর্ণকুটীর আলো করিয়া থাকিত। উদ্যানে কখন কোন অপরিচিত লোক আসিলে, সে দ্বার-রুদ্ধ করিয়া দিত, কেবল গজেন্দ্র বাবু ও তাঁহার এক-মাত্র পুত্র নরেন্দ্রনাথ উদ্যানে আসিয়া ভজহরির অবর্ত্তমানে তাহার নিকট যাহা কিছু চাহিতেন, তাহাকে অগত্যা সলজ্জ-ভাবে তাহাই দিতে হইত। তাহার ধীর প্রকৃতি এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া গজেন্দ্র বাবু অনেক সময় রহস্যচ্ছলে ভজহরিকে বলিতেন, ভজহরি! তোমার মেয়েকে দেখিয়া মনে হয়, তুমি গোবরবনে পদ্মফুল ফুটাইয়াছ। গজেন্দ্র বাবুর কথায় ভজহরি মৌখিক হাসিত বটে, কিন্তু মনে মনে বলিত, সুসঙ্গিনী

গোবরবনের পদ্ম নয়, পদ্মবনেরই পদ্ম, যদি কখন এ পদ্মের সহিত সূর্য্যের মিলন করাইতে পারি, তবেই জীবন সার্থক হইবে, নচেৎ আমার অপরাধেই এ ফুল অকালে শুখাইয়া যাইবে। সুসঙ্গিনীর রূপলাবণ্য এবং যৌবনের লক্ষণ দেখিয়া ভজহরিকে অনেক সময় তাহার শুভপরিণয়ের নিমিত্ত চিন্তায় কাতর হইতে হইত। কারণ সে জানিত যে, তাহার জাতির মধ্যে কেহই তাহার পাণিগ্রহণ করিবে না, এতদ্ব্যতীত অপর কোন ভদ্রলোক সুসঙ্গিনীর সঠিক পরিচয় না পাইলে যে তাহার পাণিগ্রহণ করিবে, এরূপ বোধ হয় না। সুসঙ্গিনীও দিন দিন যেরূপ যৌবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহাকে শীঘ্রই পরিণয়ে আবদ্ধ করা উচিত; নচেৎ কালে কুফল ফলিবে। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় কাতর হইয়া ভজহরিকে রোগগ্রস্ত হইতে হইল, কয়েক দিবস হইতে ভজহরি বিষমজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে, সুসঙ্গিনী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্তা রহিয়াছে। ভজহরি রোগগ্রস্ত হইয়াও গজেন্দ্র বাবু ও নরেন্দ্রকে ফুলের তোড়া যোগাইয়া আসিত; কিন্তু এক দিবসের জন্যও সুসঙ্গিনীকে সে কার্য্য করিতে বলিত না। ভজহরির কষ্ট দেখিয়া সুসঙ্গিনী অনেক সময় মালা ও ফুলের তোড়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইত, কিন্তু ভজহরি যাইতে দিত না।

রুগ্ন দেহ কতক্ষণ ঠিক থাকিতে পারে? অদ্য ভজহরির আর উঠিবার শক্তি নাই, প্রাতঃকাল হইতেই তাহার জ্বরের প্রকোপ বাড়িয়াছে, সে শয্যায় শুইয়া আঃ উঃ করিয়া কেবল পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। সুসঙ্গিনী তাহার মস্তকের নিকট

উপবেশন করিয়া কখন গাত্রে কখন মস্তকে হস্ত বুলাইতেছে, কখন বা মুখের নিকটে জল পাত্র লইয়া যাইতেছে। এই-রূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে ভজহরি সুসঙ্গিনীকে ফুলের তোড়া ও মালা প্রস্তুত করিতে বলিল। সুসঙ্গিনী তখন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ফুলের সাজি হস্তে লইয়া পুষ্প চয়নে বাহির হইল। সে সময়ে সুঁড়ার মধ্যে গজেন্দ্র বাবুর ন্যায় বৃহৎ পুষ্পোদ্যান একটিও ছিল না। উদ্যানটীর মধ্যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল, তাহার চারি-কোণে লতাকুঞ্জ এবং লতাকুঞ্জের চতুঃপার্শ্ব দিয়া পথ উদ্যানকে বেষ্টন করিয়া আছে, সেই পথের দুই ধারে নানাবিধ ক্রোটন পরিশোভিত। তৎপার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডে কোথাও শ্রেণীবদ্ধ গোলাপ, কোথাও চামেলি, কোথাও বেল, কোথাও বা যুঁথির বৃক্ষরাজি একত্রিত হইয়া পরিশোভিত হইতেছে। পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের উপরে গজেন্দ্র-বাবুর বৈঠকখানা, সেই বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া যে সুদীর্ঘ পথ, তাহার দুইপার্শ্বে কামিনী, চাঁপা প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ, উদ্যান দ্বারের উভয় পার্শ্ব বকুলবৃক্ষে শোভিত। এতদ্ব্যতীত বিলাতি রুচি অনুসারে গজেন্দ্র বাবু স্থানে স্থানে প্রস্তরময় মূর্ত্তি ও তন্নিকটে লৌহ ও কাচ নির্ম্মিত বসিবার আসন সকল রাখিয়াছেন। সুস-ঙ্গিনী সাজি হস্তে উদ্যানময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল। বেলা ক্রমশঃই বাড়িতেছে দেখিয়া সুসঙ্গিনী পুষ্পচয়নে ক্ষান্ত দিয়া ধীরে ধীরে নিজ গৃহমধ্যে আসিল, তৎপরে কয়েকখানি কদলি পত্র বিছাইয়া ফুলের তোড়া ও মালা গাঁথিতে বসিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকটী ফুলের তোড়া ও কয়েক ছড়া মালা প্রস্তুত করিয়া, সে গুলি

এবং কতকগুলি পূজার ফুল একটী ডালিতে সাজাইয়া সে ধীরে ধীরে ভজহরিকে কহিল, বাবা ডালি সাজান হয়েছে।

সুসঙ্গিনীর কথায় ভজহরি কহিল, "মা আজকের মত তুমি বাবুদের বাড়ী ফুল নিয়ে যাও, কাল যা হয় হবে।"

ভজহরির আদেশ পাইয়া সুসঙ্গিনী ধীরে ধীরে উদ্যান হইতে বাহির হইল; সুসঙ্গিনী বাহির হইয়া যাই পথে পদার্পণ করিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে একটি টিকটিকি যেন টিক্‌-টিক্ করিয়া বলিয়া উঠিল, যাস্‌নি সুসঙ্গিনী যাস্‌নি। পশ্চাৎ হইতে টিকটিকি ডাকাতে সুসঙ্গিনী চির-সংস্কার বশতঃ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যাইবে মনে করিল; কিন্তু বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, আর বিলম্ব করিলে হয়ত গজেন্দ্র বাবু রাগ করিবেন, এই ভয়ে সে অগত্যা অপেক্ষা করিতে পারিল না, দ্রুতপদে গজেন্দ্র বাবুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিল।

উদ্যানের বাহিরে সুদীর্ঘ রাজপথ, সেই রাজপথের অনতিদূরেই গজেন্দ্র বাবুর বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা,—অট্টালিকাটী অতি সুন্দর, দেখিলেই কোন ধনাঢ্যের বাটী বলিয়া বোধ হয়। রাজপথের উপরেই বাটী প্রবেশের বৃহৎ দ্বার, তাহার উভয় পার্শ্ব লৌহময় রেল দ্বারা পরিবেষ্টিত, দ্বারের দুই পার্শ্বে দুই খানি বড় বড় কাষ্ঠনির্ম্মিত বসিবার আসন, তাহার উপর একজন দ্বারবান শান্তিরক্ষক-বেশে বসিয়া আছে। সুরুচিসম্পন্ন গজেন্দ্র বাবু কর্ম্মে অবসর লইয়া কলিকাতার বাটী বিক্রয়পূর্ব্বক নির্জ্জনবাসের নিমিত্ত সুঁড়াতে এই বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

গজেন্দ্র বাবুর বাটীতে পরিজন অধিক নাই, পরি-

জনের মধ্যে তাঁহার একমাত্র আদরিণী পত্নী সরমা ও পুত্র নরেন্দ্র এবং রজনী নাম্নী কন্যা, এতদ্ব্যতীত চির-কুমার শ্যালক খগপতি আসিয়া কয়েক বৎসর হইতেই তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে।

খগপতির পিতা মাতার মৃত্যুর পর হইতেই সে গজেন্দ্র বাবুর বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত যে তাহার বিবাহ হয় নাই, তাহার নানাবিধ কারণ আছে। প্রথম কারণ, সরস্বতীর সহিত তাহার বিবাদ এবং দেখিতে অতিশয় কদাকার আবার বর্ণ আবলুস্ বৃক্ষকে নিন্দা করতঃ বর্ণের উজ্জ্বলতা দেখাইতেছেন, দেখিতেও অতিশয় ক্ষীণকায়, আয়তনে কমবেশ আমাদের হস্তের চারি হস্ত দীর্ঘ, হস্তদ্বয় লম্বা লম্বা সরু সরু, হাতের তুলনায় পদদ্বয় তদ্রূপ, মুখখানি গোল, নাসিকাটী খাঁদা, চক্ষু দুইটী ছোট ছোট হস্তি-চক্ষুর ন্যায়, কর্ণদ্বয়ের খরগসের কর্ণের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, মস্তকের কেশগুলি যেমন কটা তেমনি মোটা, অবিকল সজারুর কাঁটার ন্যায়। দ্বিতীয় কারণ, যতপ্রকার মাদক দ্রব্য আছে, কোনটী সেবনেই সে অপটু নহে, এতদ্ব্যতীত তাহার আর একটী গুণ আছে, স্পষ্ট কথা কহিতে পারে না; তোৎলা, সাঁড়ের গোবর যেরূপ কোন কাজে লাগে না, খগপতিও তদ্রূপ গজেন্দ্র বাবুর কোন কর্ম্মে আসিত না, সে কেবল নরেন্দ্রের দুই একটী ফাই ফর্ম্মাস খাটিত।

নরেন্দ্রের এখন পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, সে মনে মনে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, যে কলেজের চূড়ান্ত পদবি গ্রহণ করিতে না পারিলে বিবাহ করিব না।

পুত্রের প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া গজেন্দ্র বাবু সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া এক্ষণে রজনীর বিবাহের নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন, কেবল উপযুক্ত পাত্রের অভাবে শুভকার্য্য এতাবৎ-কাল হয় নাই। যখন সুসঙ্গিনী ফুলের ডালি হস্তে লইয়া গজেন্দ্র বাবুর বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন নরেন্দ্র পুস্তক পাঠ করিতে করিতে সম্মুখস্থ বারান্দায় পদচারণ করিতেছিল, তাহার দৃষ্টি সুসঙ্গিনীর প্রতি পতিত হইবা মাত্র অমনি সুসঙ্গিনী সলজ্জ বদনে অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেল।

সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গজেন্দ্র বাবু স্নান করিতে যাইতেছেন। সম্মুখে শূন্যকুম্ভ দর্শন করিয়া গালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, শূন্যকুম্ভ কে রাখ্‌লে?

সরমা ধীরে ধীরে গজেন্দ্র বাবুকে বলিল, "তুমিত আর কোথাও বেরুচ্চ না যে, শূন্যকুম্ভ দেখেছ বলে অযাত্রা হবে?"

গজেন্দ্র। কোথাও যাই না যাই, স্নান কর্ত্তে ত যাচ্চি, সম্মুখে তুমি কোন হিসাবে শূন্যকুম্ভ রাখ্‌লে, জান না যে, শূন্য-কুম্ভ গৃহস্থের অমঙ্গল. আমি যদি স্নান করতে গিয়া ডুবে মরে যাই, তা হ'লে কি হবে?

সরমা আর উত্তর না দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল; ইহা দেখিয়া গজেন্দ্র বাবু ক্রোধে আপনা আপনি বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন।

সুসঙ্গিনী এই অবকাশে ঠাকুরঘরে যাইয়া পূজার ফুল তথায় রাখিয়া তৎপরে রজনীর হস্তে মালাগুলি দিল, রজনী তাহাকে বসিতে বলিলে সে বলিল, বৈঠকখানায় এই তোড়া কয়েকটী

দিয়ে এসে বস্‌ব," এই বলিয়া সে বৈটকখানার দিকে চলিয়া গেল।

দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই নরেন্দ্র দূর হইতে সুসঙ্গিনীকে ফুলের তোড়া আনিতে দেখিয়া তাহার হস্ত হইতে ব্যগ্রতাসহকারে যেমন লইতে যাইবে, অমনি হঠাৎ সুসঙ্গিনী ভূতলে পড়িয়া গেল, নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ "আহা! আহা!" বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিল। তখন লজ্জায় সুসঙ্গিনী অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন্দ্র কহিল, "বড় লেগেছে বোধ হয়?"

সুসঙ্গিনী উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে ভূতল হইতে ফুলের তোড়াগুলি কুড়াইতে গেল। নরেন্দ্রনাথ কহিল, আমি কুড়াইয়া লইতেছি, তুমি বাড়ি যাও।

সুসঙ্গিনী নিরস্ত হইয়া তখন পুর্ব্বমত দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন্দ্র তাহার ভাব দেখিয়া মনে করিল, তাহার আর কিছু বলিবার আছে। এই ভাবিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "যদ্যপি তোমার কোন কথা বলিবার থাকে, বল?" সুসঙ্গিনী মৃদুস্বরে "না" এই কথা বলিয়া তথা হইতে, বহির্ব্বাটীর সোপান অভিমুখে গমন করিতে লাগিল, আর যাইবার কালে নরেন্দ্রের সেই মদন বিমোহন রূপলাবণ্য অন্তরে ধ্যান করিতে লাগিল।

এক এক পদ করিয়া সুসঙ্গিনী যখন সোপানের পর সোপান অবরোহণ করিতেছিল, তখন খগপতি নিম্নতল হইতে উপরে আসিতেছে; দূর হইতে সুসঙ্গিনীকে দেখিতে পাইয়া সে দুই হস্তে গুম্ফ পাকাইতে পাকাইতে এক এক বার নিজের দিকে, এক এক বার তাহার দিকে তাকাইয়া সুপুরু-

ষের পরিচয় দিতে লাগিল, সুসঙ্গিনী তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল।

"খগপতি তখন রসিকতা প্রকাশপূর্ব্বক কি কি কি সুসঙ্গিনী যে," এই কথা বলিয়া সেই সফেন বিম্বাধর বিস্তারপূর্ব্বক হা— করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুসঙ্গিনী তাহার ভাব ভঙ্গিতে ভয়ে একটু কুণ্ঠিতা হইল, খগপতি তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় বক্র করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রসিকতার পরিচয় দিয়া চলিয়া গেল। সুসঙ্গিনীও ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। যাইবার কালে সুসঙ্গিনীর চক্ষে জল আসিয়াছিল, কেন আসিয়াছিল, জানি না। সুসঙ্গিনী তখন ভজহরির কাছে না গিয়া উদ্যানস্থ একটী লতাকুঞ্জে প্রবেশ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া গুণ গুণ ধ্বনিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল কেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না, অথচ অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল। এ সময়ে কেহ যদি তাহাকে তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে সে বলিত, কেন যে কাঁদ্‌ছি, তা জানি না। যেন আপনা আপনি কান্না পাচ্চে, তাই আমি কাঁদ্‌ছি, প্রাণের ভিতর হুহু করিয়া যেন দুঃখের বন্যার মত শব্দ উঠছে; সে দুঃখ যে কি, তাও আমি জানি না, অথচ প্রাণও ধৈর্য্য মানিতেছে না; তবে এই মাত্র মনে হয়, নরেন্দ্রের হস্তে হয়ত চুম্বক-প্রস্তর ছিল, সে আমাকে যেমন স্পর্শ করিল, অমনি লোহার প্রাণ তাহার অনুগামিনী হইল। সুসঙ্গিনী কিছুক্ষণ বসিয়া নীরবে রোদন করিয়া তৎপরে পুষ্করিণীর সোপানে অবরোহণ পূর্ব্বক সেই অশ্রুমাখা চাঁদপানা মুখখানি জলে ধুইয়া

কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, ভজহরির গৃহ পুষ্করিণীর সন্নিকটেই ছিল; তাহাকে গৃহমধ্যে মলিন মুখে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভজহরি বলিল, কি হয়েছে মা?

সুসঙ্গিনী মৃদুস্বরে কহিল, না কিছু হয় নি; কিন্তু তাহাতে ভজহরির মনে প্রত্যয় হইল না, সে বারবার বলিতে লাগিল, কি হয়েছে বল?

সুসঙ্গিনী তখন আত্মভাব গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল, পায়ে কাঁটা ফুটেছে, এই কথা বলিয়া সে তখন ভ্রমর সদৃশ কৃষ্ণ অলকাগুচ্ছ দোলাইয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্তা হইল। গৃহ সজ্জিত করিবার নিমিত্ত সুসঙ্গিনী যে বস্তুটী তুলিয়া স্থানান্তরিত করিতে যাইতেছে, সেইটী অমনি হস্ত হইতে পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে সে "দূর হক্, ছাই," এই কথা বলিয়া রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিল, তথায় যেমন হাণ্ডিটী নামাইতে যাইবে, অমনি হাণ্ডিটী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, তৎপরে আর একটী হাণ্ডি লইয়া ভাত চড়াইয়া দিল। তাহার চিত্ত এমনি চঞ্চল হইয়াছিল যে, কিছুতেই সে স্থির হইতে পারিতেছে না, শরতের ধারার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া তাহার চক্ষে জলধারা আসিতেছে। সুসঙ্গিনী ভাত চড়াইয়া দিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে করিতে সেই নরেন্দ্রের কোমল মনোহর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিল। সে ধ্যানে এমনি মগ্ন হইয়াছিল যে, হাণ্ডিতে চাউল দিয়াছে, তাহা সে ভুলিয়া গেল, কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিয়া যাইবার পর তাহার ভাতের হাণ্ডির কথা মনে পড়িল, তখন সে দেখিল, সকল অন্ন পুড়িয়া গিয়াছে।

চঞ্চলমতি সুসঙ্গিনী তখন বিরক্ত হইয়া রন্ধন গৃহ হইতে

উঠিয়া গেল, তৎপরে ভজহরিকে একটু দুগ্ধ খাওয়াইয়া পূর্ব্ব-মত লতাকুঞ্জে যাইয়া বসিল। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর সে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বড় বড়কে চায়, ছোটকে চায়না কেন? কি অপরাধে ছোট বড়র নিকট ঘৃণার পাত্রী, হায় হায়! কেন ছোট হইয়া জন্মিলাম, তাইত এত দুঃখ, তাই আজ বড়র আশায় বঞ্চিত হইতে হইল। নরেন্দ্র তুমি ধনে বড়, মানে বড়, আমি ছোট, তাহাতে মালীর মেয়ে, আমার সহিত তোমার তুলনা হয় না। দুরাশায় পড়ে আজ তোমার প্রয়াসী হইয়াছি। কিন্তু সখে! ঘাসফুলেতেও যে মধুকর গুণ গুণ করিয়া বসে, তাই বলি আমার হৃদয়ে ঘাসফুল ফুটিয়াছে, তুমি একবার গুণ গুণ ধ্বনিতে হৃদয়ে বৈস, আমি জীবন সফল করিয়া লই। যদি বল সখে! তুমি আকাশের চাঁদ তোমাকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি দর্শনের বস্তু, দূর হতে তোমাকে দেখিয়া জীবন সফল করিতে হয়; কিন্তু তাহা বলিলে বিশ্বাস হয় না। কেননা তুমি আকাশের বস্তু হইয়া জলে আসিয়া ফুলের সহিত আলাপ কর, বড় হইয়া ছোটর মাহাত্ম্য বাড়াও, তাই বলি মালীর মেয়ের নিকট একবার সেই মাহাত্ম্য প্রচার কর। যে হস্তে তুমি অভাগিনীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিলে, সেই হস্তে এই অভাগিনীকে আবার স্পর্শ কর, আমি তাহাতে চিরসুখিনী হইব। একথা শুনিয়া তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই। কেননা আমি মালীর মেয়ে, আমার মানই বা কি অপমানই বা কি, যাবৎ এ জীবন থাকিবে, তুমি আমার হও বা নাই হও, আমি তোমারই থাকিব, ইহাতে দুঃখ পাইতে হয় ক্ষতি নাই"। এইরূপে সুস-

ঙ্গিনী যখন নির্জ্জনে বসিয়া একাকী আপনা আপনি আক্ষেপ করিতেছিল, তখন ভজহরি তাহাকে ডাকিল, এক বারের পর দুইবার, দুইবারের পর তিন বার, তিন বারের পর চারি বার, এইরূপে ভজহরি যতই ডাকিতে লাগিল, সুসঙ্গিনীর কর্ণে তাহার কিছুই প্রবেশ করিল না। তৎপরে অগত্যা ভজহরি অতি কষ্টে বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার ডাকিল, এবার ভজহরির ডাক শুনিতে পাইয়া অঞ্চল দ্বারা অশ্রুজল মুছিয়া সুসঙ্গিনী গৃহ অভিমুখে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশায় বঞ্চিত।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, গজেন্দ্র বাবু একদিকে যেমন কড়া মেজাজের লোক, অপরদিকে তেমনি রসিকপুরুষ। যে সময় তাঁহার মস্তিষ্ক প্রকৃত অবস্থায় থাকিত অর্থাৎ গঞ্জিকার ধূমে বিকারগ্রস্ত না হইত, সে সময় তিনি রসিকতাচ্ছলে কখন কখন সরমাকে খেঁদি, পেত্নি, রাক্ষসী, ডাইনি, স্থূর্পণখা প্রভৃতি নানাবিধ নামে ডাকিয়া তাহার সহিত রসভাষ করিতেন; সরমাও তাহার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

অদ্য প্রত্যূষে গজেন্দ্র বাবু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যখন সরমাকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি তাহাকে নাকিসুরে ডাকিলেন, স্থূর্পণখে!

সরমাও অমনি নাকিসুরে, "সুমিত্রানন্দন হাজির," এই কথা

বলিয়া একখানি ছুরিকা গ্রহণপূর্ব্বক গজেন্দ্র বাবুর হস্তে দিয়া এক হস্তে নিজ নাসিকা ও অপর হস্তে কর্ণ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গেল। গজেন্দ্র বাবু হাসিয়া কহিলেন, "কাটিতে পারি; কিন্তু ভয় হয়, পাছে খগপতি সীতা হরণ করে"। সরমা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "হরণ করুক্, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু তুমি পাছে বনে বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াও, তার তরেই আমার বেশী ভাবনা। গজেন্দ্র বাবু কহিলেন, "তবে খগপতিকে ডাকি ?" সরমা প্রত্যুত্তর দিতে না দিতে খগপতি গজেন্দ্র বাবুর গৃহের সম্মুখস্থ দরদালান দিয়া বহির্ব্বাটী অভিমুখে যাইতেছিল, গজেন্দ্র বাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়া "খগপতি খগপতি" বলিয়া ডাকি-লেন, খগপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, "কি-কি-কি বল্‌ছেন" ?

গজেন্দ্র বাবু। বল্‌ছি এই, আমার সীতাকে হরণ কর্‌তে পার্‌বে ?

খগপতি গজেন্দ্র বাবুর রসিকতা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, হ—

সরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, হাঁদারাম না হলে, এমন দুর্দ্দশা হবে কেন।

গজেন্দ্র বাবু। সীতা যদি তোমায় বে কর্ত্তে চায়, তুমি কর্ত্তে রাজি আছ ত ?

বিবাহের নামে খগপতির মুখে আর হাসি ধরে না, সে সফেন বিম্বাধার বিস্তার করিয়া কহিল, হ।

সরমা তখন তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, "মরণ আর কি দূরহ আমার সুমুখ থেকে।"

খগপতি সরমার কথা শুনিয়া কহিয়া উঠিল, তা—তা—তাতে আ—আর ক্ষ—ক্ষ—ক্ষতি কি?

সরমা এবার রাগিয়া কহিল, "পোড়ার মুখো বুঝতে পাচ্ছিস্‌নি তোকে যে ঠাট্টা কচ্ছে। মার পেটে জানোয়ার জন্মেছিস্‌, যা বেরো, কোথা যাচ্ছিস যা, দূর হ আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা।"

খগপতি তখন মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, হ, আ—আ—আমি কিনা ওঁর স—স—সম্বন্ধী, তাই ঠাট্টা কচ্ছেন।

গজেন্দ্র বাবু। সত্যিই ত, তুমি আমার সম্বন্ধী হতে যাবে কেন? তুমি আমার ভায়রা ভাই। কি হইলে সম্বন্ধী হয় আর কি হইলে ভায়রা ভাই হয়, খগপতি তাহা জানিত না।

গজেন্দ্র বাবু যে তাহাকে রহস্য করিতেছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না, সে বরং সন্তুষ্ট হইল এবং কহিল দে—দে—দেখুন দেখি দি—দিদি আবার বলছে ঠা—ঠা—ঠাট্টা করছেন।

সরমা। যা কোথা যাচ্ছিস যা।

গজেন্দ্র বাবু। না না খগপতি দাঁড়াও।

সরমা তখন সেই কুন্দবিনিন্দিত দশনাবলি অধরে দংশনপূর্ব্বক কপট ভ্রুকুটি করতঃ আরক্ত নেত্রে গজেন্দ্র বাবুর প্রতি চাহিল। রসিক গজেন্দ্র বাবু যোড়হস্ত করিয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন, "দেহি বরাভয় দানম্‌"। যে সময় গজেন্দ্র বাবু শ্যালক কুলতিলককে লইয়া রহস্য করিতেছিলেন, সেই সময় সুসঙ্গিনা গৃহ হইতে গৃহান্তরে কাহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে ছিল। সুসঙ্গিনী প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভজহরির অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই রাশিকৃত পুষ্প তুলিয়া ফুলের তোড়া ও মালা প্রস্তুত

করিয়াছিল। অদ্য সে ভজহরিকে না বলিয়া আপন ইচ্ছায় গজেন্দ্র বাবুর বাটীতে আসিয়া প্রথমে নরেন্দ্রনাথের বৈঠক-খানা অভিমুখে গমন করিল, তথায় নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে না পাইয়া, সে বোধ হয় অন্তঃপুরে আছে ভাবিয়া, নরেন্দ্র যে গৃহে থাকে সেইস্থানে উঁকি মারিয়া দেখিল, তথায়ও নরেন্দ্র নাই, তখন সে ব্যাকুল অন্তরে গজেন্দ্র বাবুর গৃহ দ্বারে আসিয়া উঁকি মারিল। সরমা তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া কহিল, কি মা? সুসঙ্গিনী তখন লজ্জিতা হইয়া কহিল, না কিছু না এই ফুল এনেছি। সরমা তখন কহিল, ঠাকুর ঘরের ফুল ঠাকুর ঘরে দিয়ে এসো, আর ঐ ঘরে রঞ্জনী আছে,—

সরমার কথা শেষ হইতে না হইতে পরিচারিকা রূপার মা আসিয়া কহিল, মা! দাদাবাবু আজ ভাত খাবেন না, তাঁর অসুখ করেছে। সরমা কহিল, "কার নরেন্দ্রের, কি অসুখ করেছে?"

রূপার মা। তা আমি জানি না।

নরেন্দ্রের অসুস্থতার কথা পুত্রবৎসল গজেন্দ্রের কর্ণে পৌঁছিবা-মাত্র তিনি ব্যস্ততা সহকারে শয্যা হইতে উঠিয়া বহির্বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে গজেন্দ্র বাবু গৃহ-দ্বারের সম্মুখে একটী ঝাঁটার কাটি দেখিতে পাইয়া, অমনি সপ্তমে চড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, কে হেথায় ঝাঁটার কাটি ফেলে? ফু‍ট সর্ব্বনাশ হবে যে।

সরমা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ঝাঁটার কাটি ফুট্‌লে আর কি হবে?

গজেন্দ্র বাবু আর একটু চটিয়া বলিলেন, কি হবে, তুমি কি

না কহাও একটি অসভ্যের লক্ষণ, বিশেষতঃ আমাদের বাটীতে থেকে কুনীতি শিক্ষা মহাদোষ।

রজনী যখন সুসঙ্গিনীকে অসভ্য অসভ্য বলিতেছিল, তখন রূপার মা দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান ছিল; সে আপনাপনি বলিয়া উঠিল, বাবা একে বলে সভ্যতা, চৈত্র বৈশাখ মাসে গরমে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে, গায়ে কাপড় রাখা যায় না, এর ওপরে এষ্টাকিন, জুতা, আবার জামা, তার উপর ফের দিয়ে কাপড় পরা, এমন সভ্যতার পায়ে গড় করি, সাত জন্ম অসভ্য হয়ে থাকি সেও ভাল, তবু যেন এ গরমে জামা জোড়া আঁটতে না হয়।

রজনী রূপার মাকে বাহিরে দেখিতে পাইয়া কহিল, রূপার মা, চার জল গরম হয়েছে? হয়ে থকেত, শীঘ্র নি[illegible] নায়।

রূপার মা আপনা আপনি বলিল, বাবা সভ্য হইলে আবার চা খাইতে হয়, এই বলিয়া চলিয়া গেল।

সেই অবকাশে সুসঙ্গিনীও ফুলের তোড়া লইয়া বহির্বাটি অভিমুখে চলিল।

রূপার মা অবিলম্বেই একটী কাচপাত্রে চা আনিয়া রজনীকে দিল, রজনী তখন স্বহস্তে চা ঢালিয়া একটী রৌপ্য নির্ম্মিত চামচের দ্বারা পান করিতে লাগিল। রজনী যখন চা পান করিতেছিল, রূপার মা তখন নাসিকায় বস্ত্র ঢাকিয়া দ্বারের এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে ওরূপ ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া রজনী ঈষৎ হাসিয়া আপনাপনি বলিতে লাগিল, অসভ্য জাতি চার মর্ম্ম কি বুঝিবে। রজনীর কথা রূপার মার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে তাহাকে কহিল, দিদি বাবু! চা খেলে কি হয় গা?

রজনী। মস্তিষ্ক বলবান হয়।

রূপার মা সেকেলে লোক, তাহাতে লেখা পড়া জানে না, সুতরাং মস্তিষ্ক উচ্চারণ করিতে না পারিয়া সে কহিল, এ দেশে মাসকড়াইয়ের বল হয়। রূপার মার কথা শুনিয়া রজনী হা হা শব্দে হাসিয়া কহিল, মূর্খ হলেই এমনি হয়। এই কথা বলিয়া সে রূপার মাকে চা খাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল, রূপার মা তখন বমনের ন্যায় ওয়াক ওয়াক শব্দ করিয়া কহিল, সাত জন্ম না খাইয়া মরি সেও ভাল তবু—

রূপার মা ও রজনী যে গৃহে কথোপকথন করিতেছিল, সরমা তথায় আসিয়া রজনীকে কহিল, রজনি! কাল না তোকে বলেছিলাম, বিবি সেজে বসে না থেকে একটু একটু সংসারের কাজ কর্ম্ম শেখ, আজ বাদে কাল বে হবে, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে কি কর্‌বি।

রজনি। ভাত রাঁদা, বাসন মাজা, বিছানা করা, কাপড় কাচা এ সব দাসীর কাজ; এ সব কাজ আমার দ্বারা হবে না, তবে যদি একটু আধটু শিল্প কাজ কত্তে বল পারি, তাই বা কখন করি, সকালবেলা উঠে চা খেতে আর পড়তেই স্কুলের বেলা হয়ে যায়, আর স্কুল থেকে এসে বন্ধু বান্ধবকে দুই এক খানা চিঠি লিখ্‌তেই সন্ধ্যা হয়ে যায়, সময় কখন বল?

রজনীর কথায় সরমা ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, বিয়ে হ'লে টের পাবে, তখন চোকের জলে দিন কেটে যাবে।

রজনী। তা মা আমি এখন থেকে বলে রাখচি, তুমি যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যার তার ঘরে আমার বে দাও, তা'হলে আমি বিষ খেয়ে মরব।

"যার কপালে যত সুখ তার কপালে তত দুখ" ব্যঙ্গভাবে এই কথা বলিয়া সরমা রূপার মাকে কহিল, রূপার মা! নরেন্দ্র কেমন আছে দেখে আয় ত।

রূপার মা তখন দ্রুতপদে নরেন্দ্রের বৈঠকখানার দিকে যাইয়া দেখিল যে, সুসঙ্গিনী ফুলের তোড়া লইয়া বৈঠকখানার দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সুসঙ্গিনী যখন ইতিপূর্ব্বে ফুলের তোড়া লইয়া নরেন্দ্রকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল, তখন নরেন্দ্র বৈঠকখানা ঘরের একপার্শ্বে শুইয়াছিল; সেই জন্য সে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। তৎপরে যখন যাইল, তখন নরেন্দ্র তাহার বন্ধু নরেশচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতেছে, সুতরাং সে লজ্জাবশতঃ ফুলের তোড়া দিতে না পারিয়া বাহিরে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নরেশচন্দ্র একে নরেন্দ্রের সমপাঠী, তাহাতে পরস্পর বন্ধুত্বে বিশেষ আবদ্ধ, সেই নিমিত্ত উভয়ে উভয়ের বাটী প্রায়ই যাতায়াত করিত। অদ্য নরেশচন্দ্র আসিয়া যখন খগপতির নিকট নরেন্দ্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, খগপতি তখন তাহার অসুস্থ সংবাদ এরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে দিয়াছিল যে, তাহাতে নরেশচন্দ্র একেবারে চমকিত হইয়াছিল। পরে যখন সে নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র কেমন আছ? তখন নরেন্দ্র উত্তর করিল, "না ঠিক কিছুই হয় নাই, তবে কাল রাত্রি হইতে মনটা কেমন হু হু কচ্চে, সারারাত্রি স্বপ্ন দেখিছি; শরীরটা জ্বর ভাব হইয়াছে, তাই মনে করিয়াছি, আজ কিছুই খাব না।"

নরেশচন্দ্র। আমাদের দেশীয় জল হাওয়া যেরূপ ও আহার

যেরূপ, তাহাতে আমাদের মত পরিশ্রমী লোকের স্বাস্থ্য কখন ভাল থাকিতে পারে না।

নরেন্দ্র। সে কথা বলা যায় না, চারিদিকে চাহিয়া দেখ, অনেকে কেমন বলিষ্ঠ, কেমন পরিশ্রমী, তাহারা আমাদের অপেক্ষা ভাল খায় না, ভাল স্থানেও বাস করে না, অল্প মূল্যের পরিচ্ছদ পরে, অথচ আমাদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। আমার মতে স্বাস্থ্য বল, দেহ বল, মন বল, সব পূর্ব্ব জন্মের ফল অনুযায়ী মানুষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নরেন্দ্র ও নরেশচন্দ্র যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, তখন রূপার মা তথায় আসিয়া সুসঙ্গিনীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাঁড়িয়ে কেন?

সুসঙ্গিনী। বাবুর কাছে কে আসিয়াছে, কেমন করিয়া তোড়া দিয়া আসি, লজ্জা করে।

রূপার মা। আমার কাছে তোড়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও, আমি তোড়া দিয়া আসিতেছি।

সুসঙ্গিনী রূপার মাকে তোড়া দিল বটে; কিন্তু চলিয়া গেল না, পূর্ব্ব মত দাঁড়াইয়া রহিল এবং রূপার মা তোড়া দিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা বাবু কেমন আছেন?

রূপার মা। বড় ভাল নাই।

সুসঙ্গিনী নরেন্দ্রের ভাল নয় সংবাদ পাইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে চলিয়া গেল, এবং উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহে না যাইয়া পূর্ব্বদিনের মত লতাকুঞ্জে গিয়া বসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রণয় না রোগ।

যে প্রণয়ের আকর্ষণী শক্তি নাই, তাহা প্রণয় নহে, কেবল কল্পনা মাত্র; তুমি যদি কাহারও নিমিত্ত ব্যাকুল হও, তাহার চরণে দেহ মন ঢালিয়া দাও, ইহপরকালের সুখস্বচ্ছন্দতা তাহার উপরে নির্ভর কর এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র তাহার ধ্যানে নিযুক্ত থাক, অথচ সে তাহা জানে না, এরূপ স্থলে স্বভাবের এমনি বিচিত্র নিয়ম যে, সেও স্থির থাকিতে পারে না; তাহারও প্রাণে তোমার প্রাণের ব্যাকুলতার তরঙ্গ উঠিতে থাকে, তাহারও আহার নিদ্রায় সুখ থাকে না, সে যেন সতত অসুস্থ ভাবে অবস্থান করে। এক্ষণে নরেন্দ্রেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। তাহার মন হুহু করে, হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, আহার নিদ্রায় সুখ নাই, কি যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার প্রাণ যেন অভাব-সমুদ্রে ভাসিতেছে। এরূপ অবস্থায় নরেন্দ্রের কষ্ট বাড়িতে লাগিল, যে দিবস সে সুসঙ্গিনীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল, সেই দিবস হইতেই তাহার অসুস্থতা ক্রমশঃ বাড়িয়া আসিতেছিল। সুসঙ্গিনী যতই তাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতে লাগিল, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার ধ্যানে নিমগ্না হইতে লাগিল, নরেন্দ্রের অসুস্থতাও ততই বাড়িতে লাগিল। সুসঙ্গিনী যে সময় সেই

নিভৃত লতাকুঞ্জে রোদন করে এবং তাহার অভাবে ভূতলে পড়িয়া অস্থির হয়, নরেন্দ্রেরও ঠিক সেই সময় প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সেও শয্যার উপর পতিত হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। উভয়ের ক্রিয়া দর্শন করিলে মনে হয়, যেন দুইটী প্রাণ এক হইয়া গিয়াছে,অথচ আশ্চর্য্য এই যে একজন তাহার কারণ জানে, অপরজন তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না। সুসঙ্গিনী জানে যে কেবল নরেন্দ্রের নিমিত্তই তাহার এইরূপ হইয়াছে ; কিন্তু নরেন্দ্র তাহা জানে না, সে জানে তাহার এক-রূপ রোগ হইয়াছে।

যে দিবস সুসঙ্গিনী ফুলের তোড়া লইয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথ তাহাকে ভূতল হইতে তুলিয়াছিল, সেই দিবস হইতেই উভয়ের মনে প্রেমের সঞ্চার হয়, কেবল একজনের কাছে তাহা অজ্ঞাত আছে, অপরের কাছে তাহা প্রকাশ হইয়া কার্য্য করিতেছে। সৎচরিত্রবান্ নরেন্দ্র যখন সুসঙ্গিনীকে ভূতল হইতে তুলিয়াছিল, নরেন্দ্রের হৃদয়ে তখন কোন বিকার হয় নাই এবং এখনও সুসঙ্গিনীর প্রতি তাহার প্রণয়ের কোন ভাব নাই, অথচ ভিতরে ভিতরে তাহার হৃদয় মধ্যে প্রণয়ের লীলা সকল প্রকাশ পাইতেছে। যদি বল এরূপ হইবার কারণ কি ? একজনের ভিতর প্রেমের ভাব নাই, অথচ তাহার হৃদয়ে প্রেমের কার্য্য সকল হইতেছে কেন ? ইহার কারণ কেবল সুসঙ্গিনীর অশ্রুজল ; সুসঙ্গিনী যদ্যপি নরেন্দ্রের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া নিয়ত রোদন না করিত, কায়মনচিত্তে অহোরাত্র নরেন্দ্রের মূর্ত্তি ধ্যান না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় নরেন্দ্রের এরূপ দশা হইত না। তাহার সেই অজ্ঞাত প্রেমাসক্তি

তখন অজ্ঞাত ভাবেই থাকিত; কিন্তু সুসঙ্গিনীর প্রণয় যতই তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল, ততই নরেন্দ্রের সেই অজ্ঞাত প্রেম ব্যক্ত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল।

দিবসের পর দিবস যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, নরেন্দ্রের উপর সুসঙ্গিনীর প্রণয়ের আধিপত্য ততই বিস্তার হইতে লাগিল। পুত্রবৎসল গজেন্দ্র বাবু নরেন্দ্রের এরূপ অসুস্থতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন এবং নরেন্দ্রকে তাহার অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে নরেন্দ্র উত্তর করিল, আমার যে কি অসুখ হইয়াছে। তাহা আমি জানি না অথচ দিবারাত্র আমার প্রাণ কেমন করে, কিছুই ভাল লাগে না, আহার করিতে ইচ্ছা হয় না। গজেন্দ্র বাবু ইহা শুনিয়া বলিলেন, তবে আর এরূপ ভাবে সময় অতিবাহিত করা উচিত নয়, রোগ যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন ডাক্তার দেখানই উচিত এই বলিয়া খগপতিকে ডাকিলেন।

খগপতি গজেন্দ্র বাবুর ডাক শুনিবামাত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল, কে-কে-কেন ডাকৃছেন?

গজেন্দ্র বাবু। কলিকাতায় যাইয়া ডাক্তার যোগেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া আনিতে পার?

খগপতি। কে-কে-কেন ডা-ডা-ডাক্তার কি কর্ত্তে আসবে?

গজেন্দ্র বাবু। কেন তুমি কি জান না, নরেন্দ্রের অসুখ করেছে?

খগপতি। হ।

গজেন্দ্র বাবু কহিলেন, তবে আর বিলম্ব ক'র না, শীঘ্র যাও।

খগপতি কলিকাতায় ডাক্তার আনিতে চলিয়া গেল। সে সময় কলিকাতা সহরে যোগেন্দ্র বাবু একজন বিখ্যাত হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসার যশ আবালবৃদ্ধ সকলেই ঘোষণা করিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যোগেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন, গজেন্দ্র বাবু তাঁহাকে নরেন্দ্রের রোগের কথা একে একে সমস্ত বলিলেন। যোগেন্দ্র বাবু তৎপরে নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, হার্ট ডিজিস্ (হৃৎপিণ্ডের রোগ) হইয়াছে, পরে তিনি তাহাকে সেইমত ঔষধ দিয়া বিদায় হইলেন। দেখিতে দেখিতে দুই তিন দিবস অতিবাহিত হইল, তথাপি নরেন্দ্রের রোগ উপশম হইল না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গজেন্দ্র বাবু তখন স্বতন্ত্র চিকিৎসক আনাইলেন; কিন্তু তিনিও কিছুই করিতে পারিলেন না। এইরূপে গজেন্দ্র বাবু এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক-কবিরাজী প্রভৃতি নানাবিধ চিকিৎসা করাইলেন; কিন্তু কিছু-তেই কিছু হইল না বরং রোগ ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতে লাগিল। এক্ষণে নরেন্দ্রের আর উঠিবার শক্তি নাই, এমন কি মুখের নিকট কর্ণ না লইয়া গেলে, তাহার কথা শুনা যায় না, পুত্রবৎসল গজেন্দ্র বাবু অতিশয় কাতর হইয়াছেন। সরমা দিবা-রাত্র তাহার মস্তকের নিকট বসিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করি-তেছে, কয়েক দিবস ধরিয়া গজেন্দ্র বাবুর অট্টালিকা নিরানন্দ-সাগরে নিমগ্ন, সবাই নরেন্দ্রের নিমিত্ত দুঃখিত।

অদ্য রজনী-প্রভাতের সঙ্গে নরেন্দ্রের রোগ পূর্ব্ব হইতে আরও বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার মুখে কথা নাই, ডাকিলে উত্তর দেয় না, কেবল আঃ উঃ ইত্যাদি করিয়া ক্রমান্বয়ে পার্শ্ব পরি-

বর্ত্তন করিতেছে। গজেন্দ্র বাবু পুনরায় যোগেন্দ্র বাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন, যোগেন্দ্র বাবু আসিয়া নরেন্দ্রের নাড়ী দেখিয়া কহিলেন, রোগ অতিশয় সঙ্কট,নানা চিকিৎসায় যখন সারিল না, তখন এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। এই কথা বলিয়া যোগেন্দ্র বাবু বিদায় হইলেন, গজেন্দ্র বাবু তাঁহার কথায় হতাশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, সরমা আছাড়িয়া পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল, রজনী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রুমালে মুখ ঢাকিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিল।

সে দিবস এইরূপেই কাটিয়া গেল, কাহারও আহার হইল না, ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া গজেন্দ্র বাবুর বিষাদপূর্ণ অট্টালিকাকে আচ্ছাদন করিল, একে একে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র গগনাকাশে যখন দেখা দিল, তখন জনৈক সন্ন্যাসী গজেন্দ্র বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে গজেন্দ্র বাবুর নিকট সংবাদ দিতে পাঠাইলেন। গজেন্দ্র বাবু নামিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসী তাঁহাকে কহিলেন, আপনি আমাকে চিনিতে পারেন? গজেন্দ্র বাবু কহিলেন, না কৈ চিনিয়াও চিনিতে প্যারিতেছি না।

সন্ন্যাসী। আমার নাম কৈলাসচন্দ্র সিংহ, এইবার কি চিনিতে পারেন?

গজেন্দ্র বাবু তখন কৈলাস বাবুর হস্ত ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এ পথ অবলম্বন করিয়াছেন কেন?

কৈলাস বাবু। সেই মেয়েটা হারাণ অবধি মনে কিছুতেই শান্তি পাই নাই, ভাবিয়াছিলাম পশ্চিমে বদলি হইলে শান্তি

পাইব ; কিন্তু তথায়ও পাইলাম না, তাই অবশেষে এই পথ গ্রহণ করিয়াছি।

গজেন্দ্র বাবু। এ পথে কিছু লাভ হইয়াছে ?

কৈলাস বাবু। এমন যে কিছু হইয়াছে তাহা নহে, তবে গুরু-দেব একদিন বলিয়াছিলেন, তোমার অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়াছে।

গজেন্দ্র বাবু। অষ্টসিদ্ধি কাহাকে বলে ?

কৈলাস বাবু। সাধন করিতে করিতে যে অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি কতকগুলি মহাগুণ জন্মায়, সেই গুণে সিদ্ধিলাভ করার নাম অষ্টসিদ্ধি।

গজেন্দ্র বাবু। আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।

কৈলাস বাবু। অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলে, মানুষ যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে অর্থাৎ অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে পারে, বায়ু অপেক্ষা লঘু হইতে পারে, আর তাহারা বাক্‌সিদ্ধ হয় এবং বশীকরণ মারণ প্রভৃতি সকল প্রকার অমানুষিক শক্তি প্রাপ্ত হয়।

কৈলাস বাবুর কথা শুনিয়া পুত্রবৎসল গজেন্দ্র বাবু তাঁহাকে তাঁহার আসন্ন বিপদের কথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কৈলাস বাবু তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া ব্যস্ততা-সহকারে বলিলেন, একবার কি তাহাকে দেখিতে পাই ?

"অবশ্য পাইবেন", এই কথা বলিয়া গজেন্দ্র বাবু তৎক্ষণাত্র কৈলাস বাবুকে সমভিব্যাহারে লইয়া নরেন্দ্রের গৃহে গিয়া উপ-স্থিত হইলেন।

কৈলাস বাবু নরেন্দ্রের শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাহার হাত দেখিয়া কহিলেন, যেরূপ নাড়ী দেখিতেছি ইহাতে প্রাণের

কোনরূপ আশঙ্কা নাই, এই কথা বলিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া নরেন্দ্রের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে অস্ফুটস্বরে কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর কৈলাস বাবু চক্ষু মেলিয়া, নরেন্দ্রের গাত্রে কয়েকটী ফুৎকার দিলেন; তৎপরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, ডাক্তারেরা কি রোগ নির্ণয় করিয়াছেন?

গজেন্দ্র বাবু। হার্ট ডিজিস্ (হৃৎপিণ্ডেররোগ)।

কৈলাস বাবু। তাদের মাথা আর মুণ্ড।

গজেন্দ্র বাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, তবে রোগটা কি?

কৈলাস বাবু। রোগটা প্রণয়রোগ, নরেন্দ্রের রূপে কোন রমণী মজিয়াছে, আর সে ইহার নিমিত্ত অতিশয় কাতর হইয়াছে, এমন কি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সে ইহারই মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছে; কিন্তু নরেন্দ্র তাহা জানে না বলিয়া উহার এইরূপ দশা হইয়াছে। এক্ষণে যদ্যপি নরেন্দ্রকে দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করাইতে পারেন, তবেই এ রোগ সারিবে, নচেৎ সারিবে না।

কৈলাস বাবুর কথা শুনিয়া গজেন্দ্র বাবু ও আর আর যাঁহারা ছিলেন সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ইতিপূর্ব্বেই কৈলাস বাবুর হস্ত বুলান দ্বারা নরেন্দ্র একটু সুস্থ হইয়াছিল, সে তখন মনে মনে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কাহাকেও ভালবাসে কি না; কিন্তু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে কে তাহাকে ভালবাসে, ইহা জানিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল।

কৈলাস বাবু গজেন্দ্র বাবুকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, বোধ হয় আমার কথায় বিশ্বাস হইতেছে না; কিন্তু

আমি মন্ত্রবলে তাহাকে আনাইয়া দেখাইতে পারি, কে তাহাকে ভালবাসে।

কৈলাস বাবুর কথায় গজেন্দ্র বাবু আনন্দিত হইয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং অদ্য রজনীতে এ কার্য্য যাহাতে সমাধা হয়, এ নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

কৈলাস বাবু তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন, সহস্র জবা ও বিল্বদল আনিয়া দিন, আর বাটীর বহির্দ্বার হইতে এই গৃহের দ্বার খুলিয়া রাখুন এবং যে কেহ আসিবে, দ্বারবান যেন তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয়।

গজেন্দ্র বাবু তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। তাঁহার উদ্যানে জবাবৃক্ষের ও বিল্ববৃক্ষের অভাব ছিল না, সুতরাং সহস্র জবা ও বিল্বদল আনিতে বিলম্ব হইল না।

ক্রমে মুহূর্ত্ত করিয়া রজনী দশ ঘটিকায় পদার্পণ করিল, কৈলাস বাবু গৃহের এক পার্শ্বে পূজায় বসিলেন, একে একে এক একটী করিয়া সহস্রটা জবা ও বিল্বদল দিয়া প্রায় রাত্রি দুই প্রহর অবধি পূজা করিতে লাগিলেন। যখন কৈলাস বাবু পূজা করিতেছিলেন, তখন সুসঙ্গিনী নিদ্রা যাইতেছিল। যেমন কৈলাস বাবুর পূজা সাঙ্গ হইল, অমনি সে নিদ্রিতাবস্থায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গজেন্দ্র বাবুর বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তৎপরে যে গৃহে নরেন্দ্র ও কৈলাস বাবু প্রভৃতি ছিলেন, সেই গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। সুসঙ্গিনীকে দেখিবামাত্র সকলেই চমকিত হইল।

পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্রের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, এক্ষণে সুসঙ্গিনীর চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া, আরও আন্দোলিত

হইল। তাহার সেই সৌদামিনী সদৃশ রূপলাবণ্য এবং সেই ভ্রমর সদৃশ কৃষ্ণ অলকাগুচ্ছে বেষ্টিত চাঁদপানা মুখখানি নরেন্দ্রের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গেল।

তাহাকে দেখিবামাত্রই যেন নরেন্দ্রের রোগের উপশম হইতে লাগিল, সে একবার তাহার দিকে চাহিতে লাগিল, আবার গুরুজনের ভয়ে লজ্জায় চক্ষু মুদিত করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইতে লাগিল।

সুসঙ্গিনী যখন গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার অবয়ব দেখিয়া কৈলাস বাবুর সেই হারাণ কন্যার কথা মনে পড়িয়াছিল, তিনি অনিমিষ-নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, মেয়েটা দেখিতে ঠিক আমার সুসঙ্গিনীর মত। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল কৈলাস বাবু পুনরায় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তখন সুসঙ্গিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না; নিদ্রিত অবস্থায় পশ্চাৎ ফিরিয়া পুনরায় এক এক পদ করিয়া উদ্যানে গিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিল।

সুসঙ্গিনী চলিয়া যাইবার পর গজেন্দ্র বাবু কহিলেন, ওটাত আমার মালীর মেয়ে, উহার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, আর এরূপ প্রণয়ও অস্বাভাবিক, ইহা ভদ্রোচিত নহে; এস্থলে কি করা উচিত আমাকে সৎযুক্তি দিন।

কৈলাস বাবু। যতদিন না নরেন্দ্র সুস্থ হয়, ততদিন উহাকে ইহার নিকট আসিতে দিন। তৎপরে যাহা সৎযুক্তি হয় করিবেন, আমার মতে বিবাহ দেওয়াই উচিত; কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইবে।

গজেন্দ্র বাবু কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে তাঁহারই কথায় সম্মত হইলেন। তৎপরে কৈলাস বাবুর আহারের নিমিত্ত তাঁহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং সে রাত্রি কৈলাস বাবু গজেন্দ্র বাবুর বাটীতেই থাকিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নষ্টচন্দ্র।

নিশাথের চন্দ্র পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, নক্ষত্রগণ একে একে তাহার অনুগামিনী হইল; পূর্ব্বাকাশে উষা দেখা দিল, গজেন্দ্র বাবুর উদ্যানস্থ বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া জাগিয়া যেন বলিয়া উঠিল "জাগো সুসঙ্গিনী জাগো, কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া জাগো"। বিহঙ্গের ডাক শুনিয়া সুসঙ্গিনী জাগিয়া উঠিল; কিন্তু শয্যা পরিত্যাগ করিল না। সে যে দিবস নরেন্দ্রের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, সেই দিবস হইতেই সে আহার নিদ্রা এবং সুখসচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। অধীর প্রাণে দিবারাত্র সে অশান্তিতে বাস করে, অনেক সময় সে শয্যা সার করিয়া নরেন্দ্রের রূপ-চিন্তায় নিমগ্না থাকিত, সুসঙ্গিনী শয্যায় শুইয়া গতকল্য রজনীর স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে লাগিল। কৈলাস বাবুর মন্ত্রবলে সে যে তথায় গিয়াছিল, তাহা সে জানে না, অথচ স্বপ্ন-দর্শনের ন্যায় তাহার সেই সকল ঘটনাবলী প্রতীয়মান হইতেছে। সে আপনি বলিতে লাগিল,

কেন ঘুম ভাঙ্গিল, তাইত সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, নরেন্দ্রকে কেমন দেখিতেছিলাম, কেমন সে রোগ-শয্যায় থাকিয়া অপাঙ্গ-ভঙ্গে আমাকে কত আশ্বাসিত করিল, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ঢালিয়া দিল, কত সুখ কত শান্তি সে কথা আর কি বলিব, পাখি ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল, তাই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। হায় এমন দিন কি হবে, অলীক স্বপ্ন সত্য হইবে, এই রূপ বলিতে বলিতে সুসঙ্গিনীর চক্ষের জলে মাথার বালিস ভিজিয়া গেল, পাছে ভজহরি তাহার চক্ষে জল দেখিলে কিছু মনে করে, এই নিমিত্তই সে মুখে ঢাকা দিয়া অসুস্থতার ভাণ করিয়া ক্রমান্বয়ে স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে লাগিল।

কয়েক দিবস হইতে ভজহরি সুস্থ হইয়াছে, সে যে দিন পথ্য পাইয়াছে, সেই দিন অবধি সে আর সুসঙ্গিনীকে গজেন্দ্র বাবুর বাটীতে যাইতে দেয় না, সেও যাইবার নিমিত্ত ভজহরিকে অনুরোধ করিত না। অদ্য ভজহরি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া সুসঙ্গিনীকে ডাকিল, সুসঙ্গিনী বলিল, আমার অসুখ করেছে, আমি উঠ্‌তে পাচ্ছি না। কয়েক দিবস অবধি সুসঙ্গিনী অসুস্থ হইয়াছে, সেই নিমিত্ত সে দুঃখিত হইল এবং তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, পূর্ব্বমত ফুলের ডালি সাজাইয়া গজেন্দ্র বাবুর বাটী অভিমুখে গমন করিল। ভজহরি যখন দ্বারে প্রবেশ করিল, তখন খগপতি দ্বারবানের সহিত রসভাষ করিতেছিল, খগপতি অনেক সময় বন্ধুর অভাবে রামসিং পাঁড়ের সহিত মনের কথা কহিত।

পাঁড়ে। বাবুসাহেব আপকো তো সাধি নাহি হুয়া, আপ উনকো সাধিকরনে সে আচ্ছি হোগা।

খগপতি রামসিংহের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, ত-ত-তা ও রা-রা-জি পাতা তো হা হাম তো সম্মত হোতা।

খগপতির কথা শেষ হইতে না হইতে ভজহরি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভজহরিকে দেখিয়া রামসিং বলিয়া উঠিল, আরে ভজহরি তেরা লেড়কি এসি ছি-ছি-ছি! ভজহরি তাহা বুঝিতে না পারিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল, সেই সময় খগপতি বলিয়া উঠিল, ভ-ভ-ভজা তোর মেয়ের এ-এ-ত গুণ! ভজহরি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, এক এক পদে বাটীর মধ্যে যাইতে লাগিল, দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই রূপার মার সহিত দেখা হইল।

রূপার মা। ছিছি ভজহরি তোর মেয়ের এই কাজ!

ভজহরি। হ্যাঁগা কি হয়েছে?

রূপার মা। তোর মেয়ে বাবুর ছেলেকে মন্ত্রের গুণে ভেড়া ক'রে ফেলেছিল, তাই বাবুর ছেলের অমন অসুখ করেছিল। ভাগ্যে কাল একজন সন্ন্যাসী এসেছিল, তাই সে রক্ষা পেলে, নচেৎ কালকেই শেষ হয়ে যেত। ভজহরি বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, "রূপার মা কি হয়েছে খুলে বল, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

রূপার মা তখন সুসঙ্গিনীর ভালবাসার কথা, তৎপরে সন্ন্যাসী যে তাহাকে মন্ত্রবলে কন্যা আনিয়াছিল ইত্যাদি সমস্ত বিষয় তাহাকে কহিল।

রূপার মার সহিত যখন ভজহরি কথোপকথন করিতেছিল, তখন গজেন্দ্র বাবু বারাণ্ডায় পদচারনা করিতেছিলেন, তিনি ভজহরির কথা শুনিতে পাইয়া "ভজা" বলিয়া ডাকিলেন।

ভজহরি গজেন্দ্র বাবুর ডাকের ভঙ্গী শুনিয়া বুঝিতে পারিল, অদ্য রক্ষা নাই, অগত্যা সে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

গজেন্দ্র বাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, তোর মেয়ে কি সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছিল তাত শুনেছিস্। কি বল্‌বো! আমার ছেলে একটু ভাল হ'ক তখন দেখা যাবে"। গজেন্দ্র বাবুর রাগান্বিত স্বর শুনিয়া কৈলাস বাবু গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, "উহার দোষ কি আর উহার মেয়েরই বা দোষ কি? অদৃষ্টের লিখন যাহা তাহা হইয়াছে"এই কথা বলিয়া ভজহরিকে "কহিলেন, "তোমার মেয়ের সহিত বাবুর ছেলের প্রণয় হইয়াছে ইহা বোধ হয় শুনিয়াছ, এক্ষণে বাবুর ছেলেটী যত দিন না আরোগ্য হয়, ততদিন তোমার মেয়েটীকে তাঁহার নিকট রাখিতে হইবে। পরে গজেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা হয় বিবাহ দিবেন, না হয়, যাহা হয় হইবে।" এই বলিয়া কৈলাস বাবু গজেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে বিদায় হইলেন, যাইবার কালে আবার দেখা হইবে বলিয়া গেলেন। ভজহরি কৈলাস বাবুর কথা শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, ভালই হইয়াছে, যদি নারায়ণ এ মিলন করিয়া দেন, তবেই পরিশ্রম সফল হইবে। তখন সে ফুলের ডালি সেই স্থানে রাখিয়া কৈলাস বাবুর কথামত দ্রুতপদে সুসঙ্গিনীকে আনিতে চলিল। ভজহরি যাইবার পূর্ব্বেই সুসঙ্গিনী শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্তা হইয়াছিল। ভজহরি তথায় উপস্থিত হইয়া সকল কথা গোপন রাখিয়া তাহাকে কহিল, "সুসঙ্গিনী মা তোকে বাবু ডাক্‌ছেন, তুই শীঘ্র চল।"

সুসঙ্গিনী প্রথমে যাইতে অস্বীকৃতা হইল, পরে ভজহরি বার বার বলাতে অগত্যা ভজহরির সহিত চলিল, যাইবার কালে তাহার পদে যেন কণ্টক বিঁধিতে লাগিল, কে যেন তাহাকে ধাক্কা দিতে লাগিল, তাহার প্রাণ বলে চল চল চল নরেন্দ্রকে গিয়া দেখি ; কিন্তু তাহার চরণ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। যে পথ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রম করা যায়, সেই পথ আজ আর সুসঙ্গিনীর নিকট ফুরায় না, সে অতিকষ্টে গজেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। সে যখন এক এক পদ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তাহাকে দেখিয়া রূপার মা ও বাটীর সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল ; সে তাহা বুঝিতে না পরিয়া সরমার গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। সরমা তাহাকে দেখিবামাত্রই, মুখপুড়ি ডাইনি তুই আমার ছেলের রক্ত চুসে খেয়েছিস্ ইত্যাদি বলিয়া গালি দিয়া এক বাটী তপ্ত দুগ্ধ লইয়া তাহার মুখের নিকট ধরিল। সরমার কথায় সুসঙ্গিনীর চক্ষে জল আসিল, সে দুগ্ধ খাইল না।—সে দুগ্ধ খাইতেছে না দেখিয়া "খাবিত খা নয়ত এই কিল তোর পিঠে পড়বে" বলিয়া সরমা বাম হস্তে কিল উঠাইল ; সুসঙ্গিনী ভয়ে অগত্যা দুগ্ধ খাইল। সরমা তখন একখানি উত্তম বস্ত্র লইয়া তাহাকে পরিধান করিতে দিল, সুসঙ্গিনী বস্ত্র খানি লইয়া পূর্ব্বমত দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বস্ত্র পরিধান করিতেছে না দেখিয়া সরমা এক গাছি ঝাঁটা বাহির করিয়া কহিল, "ঝাঁটা খাকি পর্‌বিত পর নয়ত তোর অদৃষ্টে এই ঝাঁটা আছে। সুসঙ্গিনী তথাপি বস্ত্র পরিল না দেখিয়া তাহাকে গৃহমধ্যে ফেলিয়া দিয়া সরমা স্বহস্তে বস্ত্র পরাইয়া দিল, তৎপর বাক্স খুলিয়া

কতকগুলি অলঙ্কার বাহির করিয়া তাহাও পরাইয়া দিল; সরমা যখন সুসঙ্গিনীকে বস্ত্রাদি পরাইতেছিল, তখন রূপার মা এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। সে সরমার চরিত্র জানিত, সরমা যেমন মুখে মুখরা, তেমনি অন্তরে সরল, সে যখন যাহাকে মনের সহিত ভালবাসে, তখন তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকে। রূপার মা সুসঙ্গিনীকে কহিল, "কাঁদিস্‌নি মার কথাই ঐ রকম।" সরমা অঞ্চল দিয়া তাহার মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "ফের যদি কাঁদ্‌বি তা'হলে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তোকে বাটীর বার করে দিব, রাক্ষসী ডাইনি পেত্নী মানুষখাকি আমার ছেলের সর্ব্ব-নাশ করেছিস্‌, আবার কান্না।" এই বলিয়া হাত ধরিয়া সবলে তাহাকে লইয়া নরেন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল।

কল্য রজনী হইতে নরেন্দ্র সুস্থ হইয়াছে; এখন তাহার আর সেরূপ ভাব নাই, সে যেন এক বারেই সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে।

নরেন্দ্র সুসঙ্গিনীকে দেখিবামাত্রই লজ্জায় পার্শ্ব ফিরিয়া শুইল।

সরমা তখন সুসঙ্গিনীকে সেই ঘরে বসাইয়া রাখিয়া কহিল, "যদি তুই ঘর থেকে বেরুবি, তা'হলে তোর অদৃষ্টে আজ বড়ই দুঃখ আছে।" এই কথা বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া যে গৃহে গজেন্দ্রবাবু বসিয়া আছেন, সরমা সেইগৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবকাশে সুসঙ্গিনীও গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সরমা গজেন্দ্র বাবুর নিকট যাইয়া গলায় বস্ত্র দিয়া যোড় হস্তে দাঁড়া-ইয়া কহিল, "দাসীর একটী নিবেদন আছে।' গজেন্দ্র বাবুর পুত্র

সুস্থ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনের আর কোন বিকার নাই। তিনি বলিলেন, "কি সরমে ?"

সরমা। আগে বল, যা বলবো তা শুন্‌ব।

গজেন্দ্র। শুন্‌বার যোগ্য হলেই শুনব।

সরমা। সুসঙ্গিনীকে বৌ কর্‌তে সাধ হয়েছে।

গজেন্দ্র। তা কেমন করে হতে পারে, জাত দিতে পারি না ত।

সরমা। জাতে আবশ্যক কি ? নরেন্দ্রের সুখই সর্ব্বস্ব।

গজেন্দ্র। তা কখন হতে পারে না, এতে আমার ছেলে সুখী হ'ক বা নাই হ'ক তাতে ক্ষতি নাই।

সরমা আর দ্বিরুক্তি করিল না, সে রাগে বস্ত্র খানি ছিঁড়িয়া ফেলিল, মস্তকের কেশ এলাইয়া দিল, অঙ্গ হইতে অলঙ্কার গুলি খুলিয়া গজেন্দ্র বাবুর গাত্রে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তৎপরে ভূতলে মস্তক দুম্ দুম্ করিয়া খুঁড়িয়া অবশেষে ক্রোধভরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া দ্রুতগতিতে নিজ গৃহ অভিমুখে চলিয়া গেল। যাইবার কালে সুসঙ্গিনীকে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "পোড়ারমুখি, ফের ঘরের বাহিরে এসেছিস্. বেরো আমার বাড়ী থেকে, দূরহ। সুসঙ্গিনী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে অলঙ্কার গুলি ও বস্ত্র খানি খুলিয়া নিজ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই গুলি সরমাকে দিতে গেল, সরমা কহিল, তোর জিনিষ আমি নেবো কেন ? নিম্নে যাবিত যা, তা না হলে এই ঝাঁটার বাড়ি তোকে মার্‌ব।"

সুসঙ্গিনী অগত্যা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই গুলি লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আঁধারে আলোক।

অদ্য গজেন্দ্র বাবুর বিষম সঙ্কট উপস্থিত, একদিকে নরেন্দ্রের জীবন রক্ষা অপর দিকে জাতি নষ্ট, এই দ্বিবিধ ফেরে গজেন্দ্র বাবু আবদ্ধ হইয়া অস্থিত পঙ্ককে পড়িয়াছেন, তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমুড় হইয়া নীরবে বসিয়া ভাবিতেছেন, কেমন করিয়া দুই দিক্ বজায় হয়, কোন উপায় অবলম্বন করিলে নরেন্দ্রের জীবন পাওয়া যায় অথচ জাতিরক্ষা হয়। এই বিষম সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার আসিতে লাগিল, একেই তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ উগ্র তাহাতে এই বিষম চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া এক এক-বার তাঁহার সুসঙ্গিনী ও ভজহরির প্রতি ক্রোধের উদয় হইতে লাগিল। তিনি মধ্যে মধ্যে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন; "এরাই আমার সর্ব্বনাশের মূল;" কিন্তু এই ক্রোধের ভাব তাঁহার অধিকক্ষণ থাকিল না, পরক্ষণেই আবার তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তন হইল তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওদেরই বা দোষ কি? অদৃষ্টের লিখন যাহা তাহা হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে উপায় কি? নরেন্দ্রের জন্যই এই ধন সম্পত্তি, সেই নরেন্দ্রই যদি সুসঙ্গিনীর জন্য জীবন ত্যাগ করে, তাহা হইলে এই ধন সম্পত্তিতেই বা সুখ কি? যাহাকে

জীবনসর্ব্বস্ব করিয়াছি, সেই যদি চিরদিনের তরে কাঁদাইয়া যায়, তাহা হইলে এ জীবনেই বা সুখ কি ? কিছুই নয়। অথচ জানিয়া শুনিয়া নিজের সুখের নিজেই হন্তারক হইতেছি, আমি কেমন করিয়া সমাজকে তুচ্ছ করি, আজ যদি আমি সুসঙ্গিনীর সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ দিই, কাল হিন্দু সমাজ আমাকে ঘৃণা করিয়া জাতিচ্যুত করিবে। কেবল তাহাই নহে" রজনীর বিবাহ হওয়া অতিশয় সুকঠিন হইবে। যদিও ভজহরি জাতিতে কট্‌কি কায়স্থ ; কিন্তু উহাদের সহিত আমাদের যখন চলিত নাই, আর চলিত থাকিলেই বা লোকে কি বলিবে ? সামান্য একজন মালীর মেয়ের সহিত আমার মত ব্যক্তির ছেলের কথনই বিবাহ হইতে পারে না, অথচ বিবাহ না দিলেও নরেন্দ্রের জীবন রক্ষা হয় না," এইরূপ কথা বলিতে বলিতে গজেন্দ্র বাবু পদচালনা করিতে লাগিলেন। যে অবধি সরমা চলিয়া গিয়াছে, সেই অবধি গজেন্দ্র বাবু এইরূপে কখন বসিয়া কখন বা বেড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন, অথচ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

আমরা বলি গজেন্দ্র বাবু বিষয়টা যদ্যপি একবার তলাইয়া বুঝিতেন, তাহা হইলে এত চিন্তা করিতে হইত না, কেননা তাঁহার চিন্তার মূল কেবল জাতি নষ্টের ভয় ; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে যে দিবস নরেন্দ্র ও সুসঙ্গিনীর পরস্পর প্রণয় হইয়াছে, সেই দিন হইতেই জাতিত্যের মস্তকে কুঠার পড়িয়াছে, কারণ স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ই প্রকৃত বিবাহ, আর যে বিবাহে প্রণয় নাই তাহা বিবাহই নহে, তাহা কেবল নামে, বিবাহ কার্য্যে নহে। আর বিবাহ হইলেই গোত্রের ভিন্নতা

থাকে না, পাত্র পাত্রী এক গোত্র হইয়া যায়, তাহা হইলে এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে সুসঙ্গিনী ও নরেন্দ্র পরস্পরের মধ্যে যখন প্রণয় স্থাপন হইয়াছে তখন পরস্পরের বিবাহই হইয়া গিয়াছে, কেবল বাহিরের মাল্য বিনিময়টা বাকি, নচেৎ আর আর সমস্তই হইয়াছে, তাহা হইলে গজেন্দ্র বাবু যে জাতি নষ্টের ভয় করিতেছেন, সে ভয় এক্ষণে বৃথা, কারণ পূর্ব্বেই জাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গজেন্দ্র বাবু এ সমস্ত বিষয় ভালরূপে না বুঝিয়া অনবরত চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া গিয়া বেলা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অথচ তাঁহার ভ্রুক্ষেপ নাই, রূপার মা দুই তিনবার আহারের নিমিত্ত ডাকিতে আসিল, তথাপি তিনি আহার করিতে যাইলেন না। দেখিতে দেখিতে, সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িলেন, ছায়াদেবীও তাঁহারপশ্চাৎ অনুগামিনী হইয়া উত্তপ্ত ধরণীকে শীতল করিতে লাগিলেন। গজেন্দ্রবাবু তথাপি আহার করিতে যাইলেন না, বাটীর দাস দাসী সকলেই তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণরূপ জানিত, সুতরাং কেহই দুই একবারের অধিক তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিল না। সমস্ত বেলা অতিবাহিত হইল অথচ গজেন্দ্র বাবু খাইতে আসিতেছেন না, এই সংবাদ যখন রজনীর কর্ণে গিয়া পৌঁছিল, তখন সে হস্তস্থিত বোকাসিও নামক পুস্তকখানি টেবিলের উপর রাখিয়া রূপার মাকে ডাকিল, রূপার মা তৎক্ষণাৎ তথায় আসিল, রজনী রূপার মাকে দেখিয়া ভ্রুকুটি পূর্ব্বক কহিল, "বাবা এখন খায়নি তুই আমায় বলতে পারিস্‌নি।"

রূপার মা মনে মনে কহিল, কি পিতৃভক্তি! সে রজনীর স্বভাব জানিত, তাহার কথার উত্তর না দিলে, সে আরও দশ কথা শুনাইয়া দেয়, সেই জন্য সে অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিল, পাছে তোমার পড়ার ক্ষতি হয়, সেই জন্য বলি নাই।

"তা বলিলে কি হয়, একজন মানুষ খায়নি,"—এই কথা বলিয়া সে চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে বহির্ব্বাটী অভিমুখে গমন করিল। ক্রমে যে গৃহে গজেন্দ্র বাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন, রজনী তথায় গিয়া উপস্থিত হইল।

গজেন্দ্র বাবু রজনীকে তথায় আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রজনী? রজনী কহিল, আপনি সারাদিন খান নাই কি?

গজেন্দ্র বাবু কহিলেন, কে বলিল।

রজনী কহিল, এই শুন্‌লাম,আপনি সারাদিন খান নাই,কাল সকাল হইতে দরজায় খিল দিয়া শুইয়া আছেন,এর কারণ কি?

ভাবিয়া চিন্তিয়া যে যখন কিছুই স্থির করিতে পারে না, সে তখন এমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, একজন সামান্যের নিকটেও বুদ্ধির সাহায্য প্রার্থনা করে। গজেন্দ্র বাবুও ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে রজনীর নিকট সরমার অভিমান ও নরেন্দ্রের প্রণয়ের বিষয় সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুটিলমতি রজনী অমনি বলিয়া উঠিল, আমার মতে ভজা আর তার মেয়েটাকে এই দণ্ডেই বাটী হইতে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কেন না ওরকম লোককে রাখ্‌লে দাদার পক্ষে বড়ই

অমঙ্গল, আর দাদার বিষয়ে যে ভয় আপনি কচ্ছেন, তা দুদিন বাদেই ভুলে যাবেন ; কিন্তু কাছে থাকিলে বরং আরও খারাপ হবে। আর যদি মার কথা বলেন, মার ক্ষেপা বুদ্ধি, তা না হইলে কি আজ মালীর মেয়ের সঙ্গে দাদার বিবাহ দিতে চান, মার কথা শুন্‌বেন না।

রজনীর সংযুক্তিই গজেন্দ্র বাবুর ঠিক বলিয়া বিবেচনা হইল, তিনি তখন খগপতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, এই দণ্ডেই ভজাকে আর তার মেয়েকে আমার বাগানবাটী হইতে চলিয়া যাইতে বল।

রজনী বলিল, শুদ্ধ মামার কথায় হবে না, আমি শুদ্ধ যাই, এই বলিয়া সেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উদ্যান যাইবার পূর্ব্বে খগপতি দ্রুতপদে রামসিংহের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ করিল যে, পথ হইতে সুসঙ্গিনীকে কাড়িয়া লইয়া দুইজনে এক জায়গায় রাখিয়া ভোগ করিব।

অর্থের খাতিরে রামসিং আজ কয়েক বৎসর হইল বিদেশে পড়িয়া আছে, প্রাণাধিক পত্নীর বিরহে সে নিত্য কাতর হইত, এক্ষণে খগপতির কথায় তাহার কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ তাহার মতে মত দিল।

সে অমনি বাটী হইতে যষ্টিহস্তে বাহির হইয়া খগপতির নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

যখন খগপতি রামসিং পাঁড়ের সহিত সুসঙ্গিনীকে হরণ করিবার পরামর্শ করিতেছিল, তখন রজনী একাকী উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভজহরিকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক তথা হইতে

বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছিল, রজনীর তিরস্কারে ভজহরি কহিল, দিদিবাবু কি অপরাধে বাবু আমাকে জবাব দিলেন।

ভজহরির কথায় রজনী আরক্তলোচনে ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, সে কথায় তোর আবশ্যক নাই, এখন তুই তোর মেয়েকে নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে যা।

ভজহরি কহিল, এ রাত্রে আমি কোথায় যাব? যদি যেতে হয় ত কাল সকালেই যাব। রজনী তখন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কর্কশ স্বরে কহিল, না, তা কখনই হবে না, তুই এখনি তোর কালামুখী মেয়েকে নিয়ে বাগান হতে বেরিয়ে যা, অমন কুলটা মেয়ে যার আছে, তার আবার স্থানের অভাব কি?

রজনী যখন এইরূপে ভৎ‍র্সনা করিতেছিল, তখন সুসঙ্গিনী নীরবে তাহার পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মান ছিল, এক্ষণে রজনীর দুর্ব্বাক্য গুলি তাহার হৃদয়ে বজ্রের মত বাজিল, সে আর স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না; তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, সে দশদিক অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল এবং অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ভাসাইল।

ভজহরি এতক্ষণ রজনীর তিরস্কারে ব্যথিত হয় নাই; কিন্তু যখন রজনী তাহার প্রাণাধিক সুসঙ্গিনীকে কুলটা কালামুখি ইত্যাদি দুর্ব্বাক্যে অপমানিত করিল, তখন তাহারও চক্ষে জল আসিল।

কঠিনপ্রাণা রজনী তথাপি ক্ষান্ত হইল না, সে বার বার চীৎকার করিয়া তাহাকে উদ্যান হইতে বাহিরে যাইতে বলিতে লাগিল; রজনীর চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া খগপতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রজনী তাহাকে দেখিয়া কহিল, খগ মামা

তুমি ভজাকে আর তার মেয়েটাকে হাত ধরে বাগান থেকে বার করে দাওত।

ষণ্ড খগপতি যখন ভজহরির হস্ত ধরিবার উপক্রম করিল, তখন ভজহরি নিরুপায় হইয়া কহিল, আমার হাত ধর্‌তে হবে না, এখনি বেরিয়ে যাচ্ছি, এই কথা বলিয়া ভজহরি সুসঙ্গিনীকে উঠিতে বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ যাহা সামগ্রী পত্র ছিল, উভয়ে একটী বস্ত্র বিছাইয়া তাহা বন্ধন করিতে লাগিল।

এই অবকাশে খগপতি তথা হইতে চলিয়া গেল; কিন্তু রজনী তখনও পূর্ব্বমত ভ্রূকুটী করিয়া অর্দ্ধ ইংরাজী, অর্দ্ধ দেশী মেজাজে দম্ভের সহিত পদচালনা করিতে লাগিল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই,—রজনীর অর্দ্ধেক ইংরাজী অর্দ্ধেক দেশী ভাবটুকু কিরূপ,—সে সময় যদি কেহ রজনীর সম্মুখে থাকিত সে দেখিতে পাইত। রজনীর বাহিরের মূর্ত্তি যেন ইংরাজ রমণীর ন্যায়, কতই সাহসী; কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যাইত, যে সেই অন্ধকার নিশিতে সে এক এক বার বৃক্ষ-লতাদির দিকে যেমন চাহিতেছে, অমনি তাহার মনে ভূতের ভয় আসিতেছে। রজনীর এই দ্বিবিধ ভাবই দেশী বিলাতির সম্মিলন।

অতিঅল্পক্ষণের মধ্যেই ভজহরি তৈজসপত্র বন্ধন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল, রজনীও তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। ভজহরি যখন গৃহ হইতে বহির্গত হইল, তখন রাত্রি প্রায় আট ঘটিকা, নীলাকাশে অগণিত নক্ষত্রবৃন্দ যেন এক দৃষ্টে অদ্যকার ঘটনাবলী দেখিতেছে।

গজেন্দ্র বাবুর উদ্যানস্থ যাঁথি, মল্লিকা প্রভৃতি প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল সুসঙ্গিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া অন্তরে যেন তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিল, যাস্‌নি সুসঙ্গিনী আমাদের ছেড়ে যাস্‌নি। সুসঙ্গিনী সজল নেত্রে বৃক্ষলতাদির দিকে চাহিয়া মনে মনে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া এক এক পদে উদ্যান হইতে বাহির হইল। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সে গজেন্দ্র বাবুর বাটীর সম্মুখে আসিল এবং তাঁহার বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তৎসঙ্গে নীরবে দুই এক বিন্দু অশ্রুও পতিত হইল। রজনী তাহাদের বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন সুসঙ্গিনী ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! এখন আমরা কোথায় যাব? ভজহরি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,"এখন আর কোথায় যাব, তবে মনে করেছি, এই রাত্রিটা গঙ্গাতীরে থেকে কাল সকালে ষ্টিমারে উঠে দেশে চলে যাব; আর কখন কল্‌কাতায় আসব না।"

সুসঙ্গিনী ভাবিয়াছিল যে, ভজহরি কলিকাতায় অন্য কোন ভদ্রলোকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং তাহা হইলে কখন না কখন সে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু সে যখন শুনিল যে ভজহরি দেশে যাইবে আর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে না, তখন তাহার প্রাণে নূতন দুঃখের সঞ্চার হইল। হায়! সে কি করিবে, কেমন করিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া ভজহরিকে এরূপ সঙ্কল্প হইতে নিষেধ করিবে। অগত্যা সে দুঃখিত অন্তরে ভজহরির সমাভিব্যাহারে যাইতে লাগিল এবং কিছুদূর যাইয়া এক বৃক্ষলতাদি দ্বারা আচ্ছন্ন অন্ধকার স্থানে আসিয়া

যেমন উপস্থিত হইল, অমনি পশ্চাৎ হইতে রামসিং ভজহরিকে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিল, অকস্মাৎ সেই আঘাতে ভজহরি চীৎকার পূর্ব্বক বসিয়া পড়িল, সুসঙ্গিনীও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই অবকাশে খগপতি সুসঙ্গিনীর হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল, সুসঙ্গিনী অমনি চীৎকার করিয়া ভজহরিকে ডাকিল, এমন সময়ে রামসিং যেমন ভজহরিকে পুনরায় লাঠি মারিতে গেল অমনি ভজহরি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাহার লাঠি কাড়িয়া লইয়াই তাহাকে আঘাত করিল, সেই আঘাতেই রামসিং পাঁড়ে ভূতলশায়ী হইল। ভজহরি তখন আর এক লম্ফ প্রদান করিয়া খগপতিকে লক্ষ্য করিয়া এক লাঠি মারিল, খগপতি সেই আঘাতে চীৎকার করিয়া শুইয়া পড়িল। ভজহরি তখন চীৎকার করিয়া পল্লীস্থ লোক সকলকে ডাকিতে লাগিল, পল্লীবাসীরা ভজহরির চীৎকারে আলোক হস্তে বহির্গত হইল এবং তথায় আসিয়া দেখিল যে, খগপতি ও রামসিং পড়িয়া আছে। তখন তাহারা ভজহরিকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল, ভজহরি পূর্ব্ব হইতে এপর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল।

পল্লীস্থ ভদ্রলোকেরা সকলেই গজেন্দ্র বাবুকে নিন্দা করিয়া খগপতিকে প্রহারের উপক্রম করিল, এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্রই ভজহরি চিনিতে পারিল। সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কৈলাস বাবু আপনি থাক্‌তে গজেন্দ্র বাবু আমার এই সর্ব্বনাশ করিলেন।"

কৈলাস বাবু তাহাকে এই ঘটনার আদ্যোপান্ত সমুদয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভজহরি তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিল, কৈলাস বাবু এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া দুঃখিত হইলেন এবং খগপতিকে বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

আজ কয়েক দিবস হইল নগেন্দ্রের অসুস্থতা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাই তাহাকে পুনরায় দেখিবার জন্য কৈলাস বাবু গজেন্দ্র বাবুর বাটী যাইতেছিলেন এবং পথিমধ্যে এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া তাঁহার আর যাওয়া হইল না। তিনি মনে মনে গজেন্দ্রবাবুকে তিরস্কার করিয়া ভজহরিকে বলিলেন, তোমায় আর কোথাও যাইতে হইবে না, আমার বাটিতে চল, যাবৎ বাঁচিবে, তাবৎ আমার কাছে থাকিবে, এইরূপে ভজহরিকে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় বাটী ফিরিলেন।

কৈলাস বাবু যে দিবস পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসেন, সেই দিবস তিনি বর্দ্ধমান হইতে বিধুমুখীকে সমভিব্যাহারে আনিয়া কলিকাতা মাণিকতলায় একটী বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভজহরিকে তথায় লইয়া যাইলেন। বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভজহরির হঠাৎ মনে কি ভাব হইল, তাহা সে বলিতে পারে না; সে কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া সুসাঙ্গনীর জীবন বৃত্তান্ত যে পত্রিকায় লেখা ছিল, সেই পত্রিকা ও অঙ্গুরীয়টী কৈলাস বাবুর হস্তে দিয়া বলিল, আপনি কি ইহার কোন ঠিকানা জানেন? তাহা হইলে আমি তাঁহার পায়ে ধ'রে তাঁহার মেয়েটী তাঁহাকেই দিয়া আসি, কৈলাস-বাবু আলো'কে সেই পত্রিকাখানি পড়িয়া ও তৎসঙ্গে

অঙ্গুরীয়টী দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি তখন সুসঙ্গিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সুসঙ্গিনী! মা তোকে যে আবার পাব, এ আশা আর ছিল না," এই বলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, বিধুমুখী অন্তরাল হইতে সমস্ত দেখিতেছিল, সে তখন আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া আসিল। কৈলাস বাবু বলিলেন, অনেক দিনের পর আজ আমাদের হারানিধি সুসঙ্গিনীকে প্রাপ্ত হইয়াছি; এই বলিয়া পত্রখানি তাহার হস্তে দিলেন, বিধুমুখীর পত্র দেখিবার অবসর হইল না, সে সুসঙ্গিনীকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। ভজহরি এই সমস্ত দেখিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, সে রাত্রি এইরূপেই কাটিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিরহ বিকার।

পাপ কখন গোপন থাকে না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খগপতি ও রাম সিং বাটীতে আসিয়া পঁহুছিল। যখন এই বিদায় সংবাদ আসে, তখন নরেন্দ্রনাথ শয্যায় শয়ন করিয়া প্রণয়ের স্মৃতিস্বরূপ, সেই সুসঙ্গিনীর করকমল-বিরচিত শুষ্ক ফুলের তোড়াটী গ্রহণ করতঃ কখন বা বক্ষে ধারণ করিতেছে, কখন

বা তুমি ধন্যা, তোমার রূপ ধন্য, তোমার গুণ ধন্য, তোমার কারিকুরি ধন্য ; তুমি যে করে পুষ্প চয়ন করিয়াছ, সেই করদ্বয় ধন্য, মর্ত্ত্যে তোমার তুলনা নাই, স্বর্গে তুমি দুর্ল্লভ বস্তু,-তাই বলি প্রাণাধিকা তুমি ধন্যা। তোমার প্রেমের সীমা নাই, তুমি প্রেম রাজ্যের অধিশ্বরী, আমি তোমার প্রজা, ইহলোকে হউক আর পরলোকেই হউক, যত দিবস আমি থাকিব, ততদিন আমি খাজনা যোগাইব, ইহাতে ধনের বাধা, মানের বাধা সকলই উপেক্ষা করিব। ইহা ব্যতীত এ জীবনে তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান তুমিই আমার সাধন ভজন হইবে।

নরেন্দ্র যখন প্রেমের আবেগে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, সে সময় রূপার মা গৃহ দ্বার দিয়া, "ছি ছি একি মানুষের কাজ," এইকথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল, নরেন্দ্র তাহার কথা শুনিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে রূপার মা? রূপার মা প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া তৎপরে রজনীর দ্বারা ভজহরি ও সুসঙ্গিনীকে অপমানিত করিয়া উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিবার কথা এবং খগপতি ও রামসিং পাঁড়ে কর্ত্তৃক তাহাদের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিল. তৎপরে আরও কহিল, বোধ হয় তাহারা বাঁচিয়া নাই। এই কথা শুনিবামাত্র নরেন্দ্রের প্রাণ যেন বজ্রাহত হইল ; তাহার চক্ষু দিয়া দর বিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। সে উঃ আঃ ইত্যাদি বলিতে বলিতে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল, তাহার ভাব দেখিয়া রূপার মা ভীতা হইয়া দ্রুত পদে সরমার নিকট যাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল ; সরমা রূপার মার নিকট নরেন্দ্রের পুনর্ব্বার অসুস্থতার কথা শুনিয়া

দুঃখিতা হইল বটে; কিন্তু তৎসঙ্গে রজনী, খগপতি ও রামসিং পাঁড়ের প্রতি ক্রুদ্ধা হইল এবং দ্রুতপদে রজনীর গৃহে প্রবেশ করিল। রজনী তখন কাচনির্ম্মিত পাত্রে চামচ ডুবাইয়া চা খাইতেছিল। সরমা গৃহে প্রবেশ করিয়া পোড়ারমুখী, রাক্ষসী ইত্যাদি কথায় মেয়েকে গালি দিয়া রজনীর হস্তস্থিত চা পাত্র ভূমে নিক্ষেপ করিল, "তৎপরে তোর পোড়ার মুখে আগুণ, তোর মুখে আগুণ" বলিয়া টেবিলের উপরিস্থ পুস্তকগুলি ভূমে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার পরিধেয় বস্ত্র ও কুর্ত্তি ছিড়িয়া দিয়া পৃষ্ঠে গুম্ গুম্ করিয়া দুই তিনটী কিল মারিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। পরে এক ঝাঁটাহস্তে বহির্ব্বাটীতে যথায় রামসিং পাঁড়ে এবং খগপতি বসিয়া সুসঙ্গিনীর কথা আন্দোলন করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক উভয়কেই ঝাঁটা প্রহার করিতে লাগিল। দুই চারি ঘা প্রহার করিলে,'বাবারে গেলুম্রে' বলিয়া রামসিং ও খগপতি তথা হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিল।

"দূর হয়ে যা, আর এ বাটীতে ঢুকিস না," এই কথা বলিয়া সরমা হস্তস্থিত ঝাঁটা ফেলিয়া দ্রুতপদে গজেন্দ্রবাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়া গজেন্দ্রবাবুর পদে পতিত হইয়া "তোমার কি এই কাজ! তোমার কি এই কাজ!" ইত্যাদি কথা বলিয়া দম্দম্ শব্দে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

গজেন্দ্র বাবু খগপতি ও রামসিংহের অত্যাচারের কথা এ পর্য্যন্ত শুনেন নাই, তাই বলিলেন, "ব্যাপার খানা কি ছাই বল না।"

সরমা। ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ড, এই কথা বলিয়া সরমা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল।

গজেন্দ্র বাবু তখন স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তৎপরে "রজনীর কথা শুনিয়া হঠাৎ এরূপ কার্য্য করা ভাল হয় নাই" ইত্যাদি কথা বলিয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে সরমা নরেন্দ্রের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া অনেকবার ডাকের পর নরেন্দ্রের সাড়া পাইল বটে; কিন্তু সে গতিক দেখিয়া পা ছড়াইয়া ভূমে বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

সরমা যখন ক্রন্দন করিতেছে, তখন আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নরেন্দ্রের সমপাঠী বন্ধু নরেশচন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিতে আসিতেছিল। সে যখন বাটিতে প্রবেশ করিয়াই সরমার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল, তখন নরেন্দ্রের গৃহে না যাইয়া গজেন্দ্র বাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

গজেন্দ্র বাবু তখন যাহা যাহা হইয়াছিল সমস্ত কহিলেন। নরেশচন্দ্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, কাজটা ভাল হয় নাই; ভজার সঙ্গে আজ মাণিকতলার বাজারে দেখা হয়েছিল, তার মুখে শুনিলাম, সুসঙ্গিনী নাকি কৈলাস বাবুর সেই হারাণ মেয়ে; এই কথা বলিয়া সে সুসঙ্গিনীর জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু ভজহরির নিকট শুনিয়াছিল তৎসমস্তই কহিল।

গজেন্দ্র বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, কৈলাস বাবু কোথায় বাটী ভাড়া করিয়াছেন।

নরেশচন্দ্র। মাণিকতলার বাজারের ঠিক সম্মুখে; কিন্তু শুনিলাম, কৈলাস বাবু আপনার উপর বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন।

গজেন্দ্র বাবু। এখন নরেন্দ্রকে বাঁচাবার সদ্‌যুক্তি কি?

নরেশচন্দ্র। সুসঙ্গিনীর সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ দেওয়াই উচিত; কিন্তু আমার বোধ হয়, কৈলাস বাবু দিবেন না। ভজার মুখে শুনিলাম, তিনি নাকি অন্য পাত্র স্থির করিয়াছেন।

গজেন্দ্র বাবু তখন সরমার নিকটে গিয়া নরেশচন্দ্রের নিকট সুসঙ্গিনী সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন, সমুদয় বলিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন, পরে বলিলেন, নরেন্দ্রের সহিত বোধ হয় সুসঙ্গিনীর বিবাহ হইবে না।

সরমা। কেন! আবার বিবাহ হইবে না কেন?

গজেন্দ্র। আমাদের ব্যবহারে কৈলাস বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং অন্য পাত্র নাকি স্থির করিয়াছেন।

সুসঙ্গিনীর সম্বাদ শুনিয়া সরমার সেই অশ্রুপূর্ণ মুখে একবার ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের ন্যায় হাসি দেখা দিয়া আবার গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল, সে কহিল, "দেখ্‌ব কেমন কৈলাস সিংহ, কেমন আমার ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহ না দেয়," এই কথা বলিয়া সে রূপার মাকে শিবিকা আনিতে কহিল।

রূপার মা কিছুক্ষণের মধ্যে শিবিকা আনয়ন করিল, সরমা শিবিকাতে আরোহণপূর্ব্বক কৈলাসবাবুর বাটী অভিমুখে শিবিকা লইয়া যাইতে বলিল; রূপার মাও নরেশচন্দ্রের নিকট ঠিকানা জানিয়া শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

মাণিকতলার বাজার শুঁড়া হইতে অধিক দূর নয়, সুতরাং পঁহুছাইতে অধিক বিলম্ব হইল না, শিবিকা আসিয়া কৈলাস বাবুর দরজায় থামিলে, সরমা অবতরণপূর্ব্বক দুম্ দুম্ করিয়া পদ শব্দ করিতে করিতে উপরে উঠিতে লাগিল, সুসঙ্গিনী সোপানের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, সরমা সুসঙ্গিনীকে দেখিতে পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "পোড়ারমুখী তুই এখানে পালিয়ে এসে রয়েছিস্, আস্‌বিত আয়, নয় ত তোর অদৃষ্টে বড় দুঃখ আছে।"

বিধুমুখী সরমার গলার শব্দ পাইয়া "কে গা, কে গা" বলিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরমা। আমি, আমার বৌ নিতে এসেছি।

বিধুমুখী। কে তোমার বৌ ?

সরমা। তুমি কি চোকের মাথা খেয়েছ, এই যে আমার বৌ।

বিধুমুখী। আ মর মাগী, কে লা তুই ?

সরমা। এখন মর্‌ব কেন, আগে ছেলের বিয়ে দিই, তবে মর্‌ব।

বিধুমুখী। দূর হ আমার বাড়ী থেকে।

সরমা। সহজে বার হব, আমার বৌ চুরী করে রেখেছিস্ জানিস্ না।

এই কথা বলিয়া সরমা সুসঙ্গিনীকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল; তদ্দর্শনে বিধুমুখী চীৎকার করিয়া উঠিল; যখন বিধুমুখী ও সরমার দ্বন্দ্ব হইতেছিল, তখন কৈলাস বাবু গৃহমধ্যে বসিয়া তাহাদের দ্বন্দ্ব শুনিতেছিলেন, আর সরমার সরল ব্যবহার দেখিয়া হাসিতেছিলেন। ক্রমে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে না

পারিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সরমা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কৈলাস বাবু সরমার মন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিলেন, "সুসঙ্গিনীকে আপনাদের বাটীতে আর পাঠাইব না; কেন লইতে আসিয়াছেন।" সরমা রূপার মার কানে কানে, "আগে আমাকে আর নরেন্দ্রকে মারিয়া ফেলুন, তার পর পাঠাইবেন না," এই কথা তাঁহাকে বলিতে বলিল। কৈলাস বাবু কহিলেন, "আমার মেয়ের সহিত গজেন্দ্রবাবুর ছেলের বিবাহ কখনই হইতে পারে না, তিনি তাহাদের যে অপমান করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহার ছেলের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব না। আমার মেয়ের জন্য আমি অন্য পাত্র স্থির করিয়াছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র সরমা তথায় পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কৈলাস বাবু সরমার ভাব দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "বেয়ান ঠাক্‌রুণ আর কাঁদিতে হইবে না, এখন সুসঙ্গিনীকে লইয়া যান।"

কৈলাস বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে সরমার মুখে হাসি দেখা দিল, সে তখন এক ঘটী জল আনিয়া বিধুমুখীর পায়ে ঢালিয়া দিয়া কহিল, "বেয়ান এত রাগ কেন?"

বিধুমুখী সরমার ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, আর সে ইতিপূর্ব্বে কৈলাস বাবুর কথায় সরমা যে গজেন্দ্র বাবুর পত্নী তাহা জানিতে পারিয়াছিল, এক্ষণে সে তাহাকে বসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল।

সরমা। বসিবার অনেক সময় আছে, এক্ষণে আমি চলি-

লাম, এই বলিয়া সে সুসঙ্গিনীকে লইয়া শিবিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। সুসঙ্গিনীকে দেখিয়া এবং তাহার পরিচর্য্যায় নরেন্দ্র উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল।

তদ্দর্শনে গজেন্দ্র বাবু আনন্দিত হইলেন এবং নরেন্দ্রের বিবাহের নিমিত্ত কৈলাস বাবুর নিকট যাইয়া প্রস্তাব করিলেন। কৈলাস বাবু রহস্য করিয়া কহিলেন, "এ বিষয় আপনার বৈবাহিক ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।" তাহাতে গজেন্দ্র বাবু কহিলেন, "সুসঙ্গিনীর জন্মদাতা আপনি না ভজহরি?" কৈলাস বাবু বলিলেন, "যাহাই হউক, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে, এ বিষয়ের সত্যাসত্য স্থির হইবে না।" এইরূপ কিছুক্ষণ রহস্যের পর কৈলাস বাবু পঞ্জিকা দেখিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া দিলেন।

শুভ-বিবাহ।

অদ্য নরেন্দ্রের বিবাহ। সে এক্ষণে আর পূর্ব্বমত অসুস্থ নয়, আজ তাহার আনন্দের সীমা নাই। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি গজেন্দ্র বাবুর বাটীতে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ গজেন্দ্র বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তখন নরেন্দ্র বর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল, গজেন্দ্র বাবু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমভিব্যাহারে বর লইয়া মহাসমারোহের সহিত কৈলাস বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে

বিবাহের লগ্ন সময় উপস্থিত দেখিয়া কৈলাস বাবু সভাস্থ ব্যক্তি-গণের অনুমতি লইয়া নরেন্দ্রকে বিবাহস্থলে লইয়া গেলেন; অতি সমারোহের সহিত শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইল।
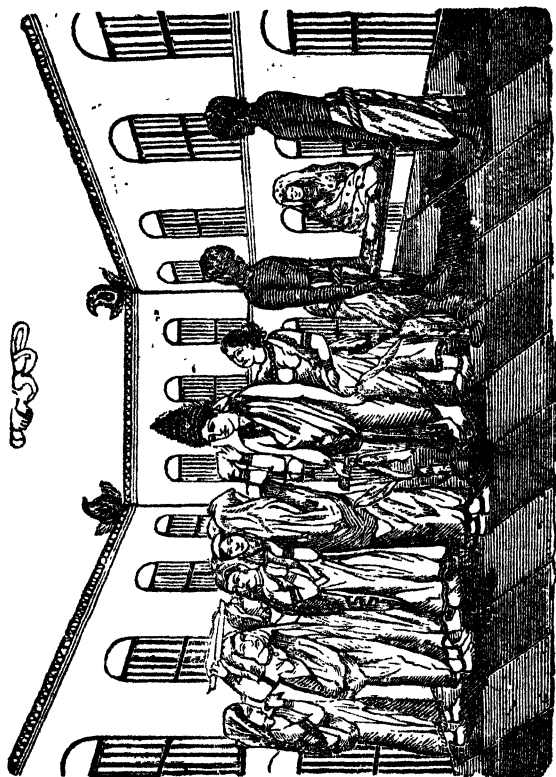
ভজহরির আজ কুড়ান মেয়ে সুসঙ্গিনীকে লালনপালন করা সার্থক হইল, এতদিনে তাহার মনসাধ পূর্ণ হইয়াছে।

সে সেই অবধি কখন কৈলাস বাবুর বাটী এবং কখন গজেন্দ্র বাবুর পুষ্পোদ্যানে আসিয়া বাস করিত। কৈলাস বাবুর অনু-গ্রহে তাহাকে আর কখন চাকরী করিতে হয় নাই।

আর চির-দুঃখিনী সুসঙ্গিনী এতদিনে নিশ্চিন্ত হইল, এখন সুসঙ্গিনীর আনন্দের পরিসীমা নাই। অতঃপর সে কখন কৈলাস

বাবুর বাটীতে, কখনবা গজেন্দ্র বাবুর পুষ্পোদ্যানে থাকিয়া সময়ে সময়ে ফুলের তোড়া ও মালা গাঁথিয়া নরেন্দ্রের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করিয়া দিত এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলকে মধ্যে মধ্যে অতি উৎকৃষ্টরূপ ফুলের তোড়া স্বহস্তে প্রস্তত করিয়া উপহার পাঠাইয়া দিত।

সম্পূর্ণ।